লুৎফ উন্না

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশ :

কার্তিক '৭০

প্রকাশিকা :

লতিকা সাহা / মডার্ন কলাম

১০/২ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :

বি. এন শীল / ইম্প্রেসন কনসালট্যান্ট

৩২/ই, জয়মিত্র ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৫

প্রকাশিকার নিবেদন

বাঙালী ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিরল পুরুষ। ঈশ্বরদত্ত প্রতিভাবলে তিনি পাঁচ হাজার বছরের ধুলোয় ঢাকা বিস্মৃত প্রায় সভ্যতার যবনিকা উন্মোচন করে প্রমাণ করেছিলেন, ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশগুলির অন্যতম।

কিন্তু আমরা ভারতীয় তথা বাঙালীরা কি আত্মবিস্মৃত! তাঁকে মনে রাখার মতো কিছুই করতে পারিনি। তাঁর মৃত্যুর পর বহু বছর অতীত হয়ে গেছে। তিনি এখন বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন প্রায়, ভাবতে অবাক লাগে তাঁর সৃষ্ট রচনা সম্ভারের সঠিক খবরও আমরা প্রায় রাখি না। ফলে তাঁর রচিত এমন অনেক গ্রন্থ আছে, যা অনেক দিন ছাপা নেই।

আমরা সেই সব দুর্লভ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে প্রথম পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করেছি 'ধ্রুবা' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসটি অল্প কিছুদিন আগে। উপন্যাসটি ইতিমধ্যেই সুধী পাঠক সাধারণের কাছে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমরা তাঁর সর্বশেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'লুৎফ উল্লা'ও সেই সব পাঠকসাধারণের হাতে তুলে দিচ্ছি, যারা সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন এই গ্রন্থটির জন্য। গ্রন্থটির মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে ডঃ সুকুমার সেন আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

ভবিষ্যতে এই বাঙালী ঐতিহাসিকের আরো কিছু দুর্লভ গ্রন্থ আমরা পর্য্যায় ক্রমে প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

'লুৎফা উল্লা' প্রতিটি সাহিত্যপিপাসু পাঠকসাধারণের কাছে সমাদর লাভ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক বিবেচিত হবে।

লতিকা সাহা

পড়েছিল এবং হিন্দুমুসলমানের দ্বন্দ্ব অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। লুৎফ উন্নার কাহিনীর মধ্য দিয়ে রাখালদাস সেই সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দিতে চেষ্টা করেছেন। দিল্লীবাসী নর-নারীর হিন্দু মুসলমানের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে নাদির শাহের অত্যাচার-স্পৃহা বাধা পেয়েছিল এবং দিল্লীতে শান্তি ফিরে এসেছিল।

রাখালদাস উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করেছেন। সুতরাং রোমান্সের দিকটাই জমিয়াছে ভালো। কিন্তু সেই সঙ্গে সমসাময়িক ইতিহাসের যথাযথ অনুসরণের ফলে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর দিল্লী সহরের Topography থাকাতে কাহিনীর রোচকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। লুৎফ উন্নার গল্প মনগড়া, পাত্রপাত্রীও প্রায় সবই কাল্পনিক, তবুও সবশুদ্ধ কাহিনীটি ইতিহাসে নথিভুক্ত ঘটনার মতই বাস্তববর্ণোজ্জল এবং বিশ্বসনীয়। অর্থাৎ রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশিষ্ট গুণ লুৎফ উন্নায় পুরামাত্রায় আছে।

আজকালকার দিনের পাঠকেরা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনেন বলে মনে হয় না। এর প্রধান কারণ রাখালদাসের উপন্যাস অনেকদিন থেকে ছাপা নেই। রাখালদাসের শেষ বইটি সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর প্রতিভার পরিচয় বহন করে পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হলে প্রকাশক বাঙ্গালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুঞ্জার বন্ধু

এক প্রহর বেলায় রৌদ্রে বসিয়া লুৎফ উল্লা তামাক টানিতে টানিতে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল। আর তামাকের মালিক কাবুলী মেওয়াওয়ালা গোলামদীন প্রত্যাশী কুকুরের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। লুৎফ উল্লার হাতে হুঁকার নল গেলে বড় সহজে আর কেহ পাইত না বলিয়া গোলামদীন বেচারা অতি করুণ ভাবে একবার লুৎফ উল্লা শাহ ফকিরের দিকে, আর একবার কলিকার দিকে চাহিতেছিল।

লুৎফ উল্লা বলিতেছিলেন, "এমন বাদশার রাজ্য থাকার চাইতে যাওয়া ভাল। আজ তিন দিন সহরে না আছে দুধ, না আছে রাবড়ী। মৌতাতী লোক বাঁচে কিসে সে দিকে বাদশার নজর নেই।"

গোলামদীন অত্যন্ত কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কলকেটায় আর কিছু আছে, ভাই?" সে কথা কানে না তুলিয়া লুৎফ উল্লা বলিয়া গেল, "এমন বাদশাহী আমিও করতে পারি, বাবা! আমার কাছে মহম্মদ শাহও যে, নাদির শাহও সেই। ভিজে শোলা চুষে চুষে গলার ভেতরটা চিংড়ি মাছের মত তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে।"

গোলামদীন অতি দীন ভাবে বলিল, "নলচেটায় আগুন ধরে গেল যে ভাই!"

এই বারে লুৎফ উল্লা চটিল। সে বলিয়া উঠিল, "বেটা ছোটলোক সুদখোর কাবুলী কিনা, তোর দোকানে বসে, তোর শটকায় তামাক খাচ্ছি, এটা তোর বাবার ভাগ্যি।"

অভিসম্পাতের ভয়ে গোলামদীন শিহরিয়া উঠিল বটে কিন্তু হুঁকার নলটা লুৎফ উল্লার হাতেই রহিয়া গেল। এমন সময়ে অতি মোলায়েম মিহি আওয়াজে পিছন হইতে কে ডাকিল, "বন্দেগী, শাহ সাহেব।" আওয়াজ শুনিয়া কান খাড়া করিয়া গোলামদীন তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু লুৎফ উল্লা একটা অশ্রাব্য কটু গালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "কে রে হারামজাদী—বেরো এখান থেকে!"

রমণী সহজে হটিবার পাত্রী নহে। সে নানা ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া ফকির সাহেবকে নিজের কাহিনা শুনাইতে আরম্ভ করিল। "তাহার খসম তিন বৎসর হইল নিকা করিয়াছে। সে কুব্জা বলিয়া তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না। তাহার জীবন-যৌবন বৃথা হইয়াছে। দিল্লী সহরের পাড়ায় পাড়ায় সে ফকির লুৎফ উল্লা শাহের সুখ্যাতি শুনিয়া তাহার চরণ তলে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে।" সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন টাকার আওয়াজ হইল। লুৎফ উল্লা মুখ ফিরাইয়া দেখিল যে, মোটে একটা টাকা পড়িয়াছে। তখন সে রাগিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাগ বেটী, এই দুর্দ্দিনে একটা টাকা! আজ তিন দিন ধরে

পাহাড়গঞ্জে গয়লারা দুধ আনে নি। রাবড়ীর চেহারা যে কি রকম, তা ভুলেই গিয়েছি। বেটী জাতে বেণে বুঝি?"

রমণী উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সে বলিয়া উঠিল, "খোদা কসম, হজরৎ যদি আমার খসমকে বশ করবার জন্য একটা জোর তাবিজ লিখে দেন, তাহ'লে নগদ এক আসরফি নজর দেব।"

আসরফির কথা শুনিয়া লুৎফ উল্লা শাহের মেজাজ একটু নরম হইল। সে রমণীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "কৈ, দেখি তোর আসরফির রং কি রকম?" রমণীর জুতার পাশ দিয়া তাহার চম্পক-বিনিন্দিত বর্ণের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। গোলামদীন কাবুলি তাহা শুষ্ক রক্তবর্ণ নেত্র দিয়া গিলিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুতরাং লুৎফ উল্লা যে হুঁকার নল ছাড়িয়াছে, তাহা সে দেখিতে পাইল না। রমণী একখানি ছোট সবুজ রেশমী রুমালের কোণে একটি নূতন মোহর বাঁধিয়া তাহা লুৎফ উল্লার পায়ের কাছে ধরিল। লুৎফ উল্লা তাহা দেখিয়া একেবারে নরম হইয়া গেল। সে বলিল, "চল্, বেটী চল্, তাবিজ লিখে দিই। তাবিজের জোরে তোর কুঁজ কি সোজা হবে?"

রমণী সেলাম করিয়া বলিল, "হজরতের মেহের বাণী হ'লে সব হবে।"

লুৎফ উল্লা আগে আগে চলিল। রমণী তাহার অনুসরণ করিল। আর গোলামদীন তাহাদের দিকে চাহিয়া তামাকের কথা ভুলিয়া গেল। অনেক আঁকা বাঁকা সরু পথ ধরিয়া

চলিতে চলিতে অনেকক্ষণ পরে একটা দুর্গন্ধময় গলিতে একটা ভাঙ্গা তিন তলা বাটীর সামনে আসিয়া তাহারা দাঁড়াইল। লুৎফ উল্লা দুয়ার খুলিয়া, চকমকী ঠুকিয়া, একটা প্রদীপ জ্বালিল। তারপর রমণীকে ভিতরে আসিতে বলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বাড়ীটা জনশূন্য। অনেকগুলি দরজা-জানালা নাই। ভিতরে উঠানে কখনও রৌদ্র আসিয়া পৌঁছায় না। উঠানের এক কোণে একটি কূয়া। রমণীকে তাহার ধারে বসিতে বলিয়া লুৎফ উল্লা নিজে একটা ভাঙ্গা কুঠরীর তালা খুলিয়া ভিতরে গেল।

ফকির ভিতরে গিয়াছে দেখিয়া রমণী সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কুঁজ ঢাকিয়া গেল। সে মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে সেই কুব্জা রমণী এক দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ হইয়া দাঁড়াইল। যে ঘরের ভিতর বসিয়া ফকির লুৎফ উল্লা শাহ একমনে তাবিজ লিখিতেছিল, যুবা সেই ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "তসলিমাৎ শাহ সাহেব।"

তাহার আওয়াজ শুনিয়া ফকির সাহেবের হাত হইতে কলম পড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কে বাবা জীন, দানা না ভূত? আমি যে দরজায় তালা দিয়ে এসেছি।"

সহসা যুবা গলার আওয়াজ বদলাইয়া ফেলিয়া বলিল, "মেরী খসম্ নেকা কিহিন হ্যায়, জনাব।"

লুৎফ উল্লা সভয়ে বলিয়া উঠিল, "ও বাবা।" তাবিজের

কাগজখানা তাহার হাত হইতে উড়িয়া গেল। যুবা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীতে তুই একখানা ঘর ভাড়া দেবে, ফকির সাহেব?" এই বলিয়া সেই রুমালে বাঁধা আসরফিটা ছুড়িয়া দিল। লুৎফ উল্লা সে দিকে না চাহিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আসরফি চাই না বাবা, খোদার কসম্ গায়ে ঠাণ্ডা জল দিস্‌নি। একেবারে মরে যাব—এক লহমায় ছ'শো বার মরে যাব, বাবা!"

যুবা দেখিল যে লুৎফ উল্লা বড়ই ভয় পাইয়াছে। তখন সে আর একটা নূতন আসরফি তাহার দিকে ছুড়িয়া দিল। দুইটা আসরফি পাইয়া লুৎফ উল্লার কতকটা আশা হইল। সে আনন্দে বলিয়া উঠিল, "তবে শুধু গায়ে ঠাণ্ডা জল দিতে আস নি? আমি মৌতাতী লোক বলে পাড়ার ছোঁড়া শালারা বড় জ্বালাতন করে।"

যুবা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল,—"না ফকির সাহেব, আমি কোন বদ মতলবে তোমার বাড়ী আসি নি। অনেক দিন ধরে সন্ধান করে তবে তোমার আড্ডা খুঁজে বার করেছি। দেখ, তোমার এই ভাঙ্গা পড়ো বাড়ীটা আমার বড়ই দরকার হয়ে পড়েছে। যে দুটো আসরফি দিয়েছি তা বায়না। আর কত ভাড়া চাই, বল?"

আনন্দে গদগদ হইয়া পাকা আফিমচী ফকির লুৎফ উল্লা শাহ বলিয়া উঠিল, "ভাড়া আর কি দেবে বাপ? ফকিরের একখানা রুটি, আর দিনান্তে কাঁচ্চা ভোর ছিটে। আর যদি পারিস বেটা এক পোয়াটাক লচ্ছেদার রাবড়ী।"

"সব মঞ্জুর শাহ সাহেব। কিন্তু আমার একটি সর্ত্ত আছে। তোমার ঐ বাহারে পোষাকটি আমায় ছেড়ে দিতে হবে। আর তোমাকে কিছু দিন এই বাড়ীর ভেতর আটক থাকতে হবে।"

"মঞ্জুর, বাবা মঞ্জুর। যদি কাঁচ্চার উপর দেড় কাঁচ্চা ছিটে ছাড়তে পার, তাহলে কি আর লুৎফ উল্লা শাহ উঠতে পারবে? চার জোড়া পরীর কাঁধে চেপে সটান বেহেস্তে চলে যাবে।"

"দেড় কাঁচ্চা কেন ফকির সাহেব? দরকার হলে রোজ আধ ছটাক ছিটে পাবে।"

নিজের গায়ের সবুজ আলখাল্লাটা খুলিতে খুলিতে লুৎফ উল্লা বলিল, "আর বলিস নি বাবা, জান্‌টা যেন এখনই কেমন উড়ু উড়ু করছে। এই নে আলখাল্লা, আর এই নে বাড়ীর চাবি। দেখ বাপজান্‌, লচ্ছেদার রাবড়ীর একটু নমুনা ছাড়তে পার বাবা?

"আজ বিকেলেই পাবে।"

যুবা সেই দুর্গন্ধময় গলিতে দাঁড়াইয়া যখন দুয়ারে চাবি দিল, তখন সে আবার কুব্জা রমণী। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া পাড়ার লোক কেহ কোন কথা বলিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলার উকীল

দিল্লী সহরের মাঝখানে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের উজীর আসদ খাঁর প্রাসাদ। সে আওরঙ্গজেবও নাই, সে আসদ খাঁও নাই। সুতরাং প্রাসাদের সে কালও নাই। বাড়ীর মালিক বাড়ীটি অনেক খণ্ড করিয়া ভাড়া দিয়াছেন। তাহারই একটা খণ্ডের সম্মুখে বসিয়া গয়ারাম বাগ্দী একটি ছোট হুঁকায় তামাক টানিতেছিল। পৌষ মাস। দিল্লীতে বিষম শীত। দ্বিতীয় প্রহর বেলাতেও রৌদ্রের জোর হয় নাই। গয়ারামের সম্মুখে তাহার পুরাতন সঙ্গী পাকা ছয় হাত বাঁশের লাঠি গাছটি পড়িয়া ছিল। এমন সময় পূর্ব্ব পরিচিতা রমণী বা যুবা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নানা কারণে গয়ারাম মুসলমান জাতির উপর বিষম চটিয়াছিল। সে রমণীকে দেখিয়া থুথু ফেলিয়া মুখ ফিরাইল। রমণী তখন ক্রন্দনের সুরে বলিতে আরম্ভ করিল—"বাবু সাহেব, খোদা তোমার ভাল করুন, আমি বড়ই দুঃখিনী।"

গয়ারাম বিষম চটিয়া বলিল, "আ মর আবাগের বেটী, তুই দুঃখিনী, তা আমি কি করব? আমাকেই কোন্ রাজা বাদশা পেলি?"

রমণী বেশে যুবা ছাড়িবার পাত্র নহে। সে আবার ইনাইয়া বিনাইয়া সুর করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবুজী,

আল্লা তোমার তরক্কী করবেন। আমি বড়ই দুঃখিনী। আমার খসম দোস্‌রা নিকা করেছে। সে আমার দিকে ফিরেও চায় না।"

গয়ারাম বিষম চটিয়া হুঁকা রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে রে হারামজাদী, শালার দেশে এসে শীতে মরে গেলাম। বেটী এত লোক থাকতে আমার পিছনে লাগ্‌লি কেন?"

"বাবুজী, আমি বড় আশা করে তোমার দুয়ারে এসেছি। শুনেছি, বাঙ্গলা মুলুকে সুবাদারের উকীল এইখানে থাকেন। তিনি কিনা বড় মেহেরবাণ্, তিনি হুকুম করলেই আমার স্বামী বশ হয়—"

"বেটী জ্বালালে। তুই আবেগের বেটী সহজে যাবি না না কি?"

"বেটা তেঁতুলে বাগ্‌দী কি না!"

যুবা অতি অস্পষ্টভাবে শেষের কথা কয়টি পরিষ্কার বাঙ্গলায় বলিল। গয়ারাম তাহা শুনিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল।

যুব" আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—"আমি বড়ই দুঃখিনী। তুমি একবার আমার উপর দয়া কর। আমি দরখাস্ত লিখে এনেছি। উকীলের হাতে দেব। ওরে বেটা ভূত, শীগ্‌গির যা না, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? এখনই কে দেখে ফেলবে? এখনও চিনতে পারলি নে?"

গয়ারাম লাঠি ও কম্বল ফেলিয়া বিদ্যুৎবেগে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং নিমেষের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রমণীবেশী

যুবাকে প্রবেশ করিতে আদেশ করিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া যুবা গয়ারামকে বলিল, "দুয়ারটা দে। বাইরের লোক কেউ আছে নাকি?"

গয়ারাম বলিল, "আজ্ঞে না, হুজুর।"

যুবা তখন মুখের অবগুণ্ঠন বা বোর্খা উঠাইয়া দিয়া দ্বিতলে চলিয়া গেল।

তখন মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দশা। বাদশাহ মহম্মদ শাহ নামে মাত্র সম্রাট। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে মুর্শিদ কুলী খাঁ তাঁহার জামাতা শুজাউদ্দীন খাঁকে রাজ্যভার দিয়া দেহত্যাগ করিয়া ছিলেন। যে দিন রমণীবেশী যুবা লুৎফ উল্লার ঘর ভাড়া করিতে গিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বেই শুজাউদ্দীন খাঁর মৃত্যু হইয়াছে। স্বাধীন হইলেও মোগল সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সুবাদাররা দিল্লীতে একজন প্রতিনিধি বা উকীল রাখিতেন। বাদশাহী দরবারে তখনও যাহা কিছু সামান্য কাজকর্ম্ম ছিল, তাহা এই উকীলরাই করিতেন। বাঙ্গালার শুজাউদ্দীন খাঁর উকীল এনায়েৎ উল্লা খাঁ তখন খাস বৈঠকে বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। তাঁহার নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে। বয়ঃক্রম আন্দাজ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন, কিন্তু দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনি এক ষোড়শী দরিদ্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সম্প্রতি কিঞ্চিৎ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এনায়েৎ উল্লা খাঁ ভীষণ স্থূল। তাঁর বর্ণটি ঘন কৃষ্ণ। ক্ষুদ্র মস্তকটি কেশশূন্য। সম্মুখের চারটি দাঁত তাঁর মায়া ত্যাগ করিয়াছে। বাদশাহের দরবারে

তিনি "আকার সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ" বলিয়া পরিচিত। দিল্লীর লোক এনায়েৎ উল্লাকে যতদূর নির্ব্বোধ বলিয়া মনে করিত, তিনি প্রকৃতপক্ষে সেরূপ ছিলেন না। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের এক দরিদ্র কৃষকের পুত্র। তিনি বুদ্ধিবলে বিদ্যার অভাব পূরণ করিয়া নবাব সরকারে চাকরি পাইয়াছিলেন। তিনি তিন টাকা বেতনের দারোগাগিরি হইতে ক্রমে ক্রমে বাদশাহ দরবারে উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জীবন-সংগ্রামে এনায়েৎ উল্লা খাঁর প্রথম পরাজয় দিল্লীর এক দরিদ্র চুড়িওয়ালার রূপসী ষোড়শী কন্যার নিকট—কিন্তু সে পরের কথা।

যুবা যখন বোর্খাটা কাঁধের উপর ফেলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল, তখন খাঁ সাহেব সম্মুখ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিয়া হুঁকার নলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুবা তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্ভ্রম প্রদর্শন না করিয়া একেবারে তাঁহার ফরাশের উপর গিয়া বসিল এবং বৃদ্ধের পিঠ চাপড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাচা কেমন আছ?" চাচা অথবা খাঁ সাহেব সম্প্রতি সুন্দর যুবা পুরুষ দেখিলেই চটিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। সুতরাং আগন্তুকের সম্ভাষণে প্রীত না হইয়া তিনি পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, "বেয়াদবী কর কেন?"

যুবা কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। আর খাঁ সাহেব বিষণ্ণ বদনে দাড়ি চুলকাইতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরে যুবা বলিয়া উঠিল, "চাচা, সাহেবজাদার জন্য একটি বাসা ঠিক করে এসেছি। যদি ভাল চাও তাহলে চাচীকে

চুড়িওয়ালার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আমাদের সঙ্গে সেইখানে চল। এখানে থাকলে চাচীও যাবে, জানও যাবে।”

বৃদ্ধ খাঁ সাহেব যুবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তাই কি পারা যায় বাপু, ইজ্জৎ যাবে যে ?”

“আর এখানে থাকলে দৌলত, ইজ্জৎ আর জান—এক সঙ্গে যাবে।”

খাঁ সাহেব উত্তর দিলেন না দেখিয়া যুবা আবার জিজ্ঞাসা করিল, “চাচা, সেই ওদিককার ঘরের ফুটফুটে পাঠান ছোঁড়াটা আছে, না গেল ?”

খাঁ সাহেবের প্রাণে ভীষণ আঘাত লাগিল। তিনি কালো মুখখানা আরও ঘোর করিয়া রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“তুমি ত বড়ই বেয়াদব ছোকরা! আমার ঘরের সকল খবর তোমাকে দেয় কে ?”

“দেয় এই পাড়ার লোক। চট কেন চাচা, আমি ত ভাল কথাই বলছি।”

“ভাল আমার মাথায় থাক্।”

“তবে তুমি যাবে না ?”

“কেমন করে আর যাই ? আর দেখ সে বাসাও সহরের মধ্যে, এ বাসাও তাই। বিশেষ ভয়ের কারণ নেই। কারণ বাদশাও স্বয়ং লড়াই করতে যাচ্ছেন।”

“তবে তুমি থাক। কিন্তু চাচা, এর পর আমায় দোষ দিও না।”

খাঁ সাহেব কিঞ্চিৎ নরম হইয়া বলিলেন, "আমিও একবার মনে করি, তোমার সঙ্গে যাই। আবার মনে হয় ইজ্জতের চাইতে জান দেওয়া ভাল।"

"চাচা তোমাদের ধর্ম্মে স্ত্রী পরিত্যাগ করা চলে। এ বেটী চাচীকে তাল্লাক দাও না।"

"তাই বা পারি কৈ রে বাপ? ছোট লোকের বেটীর তরে পাঠান ছোঁড়াটা হাঁ করে বসে আছে।"

"চাচা, এক দিকের মায়া ছাড়। সব দিক রক্ষা হয় না।"

"আরও দু' চার দিন ভেবে দেখি, বাপ্‌জান। তুমি ততদিন সাহেবজাদার উপায় কর। তারপর আমাদের যা হয় হবে।"

"মুর্শিদাবাদের খবর কিছু পেয়েছ?"

"কিছু না। নবাবের খুব শক্ত ব্যায়রাম—এই পর্য্যন্ত শুনেছি।"

"তাত আমিও জানি। তবে আর তুমি নতুন খবর দিলে কৈ?"

কূটবুদ্ধি এনায়েৎ উল্লা খাঁ তখন জানিতে পারিয়াছিল যে মুর্শিদাবাদের নবাব শুজাউদ্দীন খাঁর মৃত্যু হইয়াছে এবং বাদশাহের হুকুমের অপেক্ষা না করিয়াই তাহার পুত্র সরফরাজ খাঁ সুবাদারের মসনদ দখল করিয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল বাদশাহের দরবারে ওকালতী করিয়া মিথ্যা কথা বলাটা খাঁ সাহেবের এত বেশী অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে তিনি স্বচ্ছন্দে সত্য কথাটা গোপন করিলেন। রমণীবেশী যুবা তখন আর একবার খাঁ সাহেবের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল "চাচা,

আমরাও মানুষ, আমাদেরও চোখ কান আছে। বুড়া নবাব মরে গিয়েছে, আর সরফরাজ সুবাদার হয়েছে, এ কথা আমাকে জানালে কি ক্ষতি হ'ত ?"

খাঁ সাহেব বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল "হায় হায়, বল কি ? বল কি, আনন্দ—বুড়া নবাব নেই ? হায় হায়!"

তখন দুয়ারে দাঁড়াইয়া বোর্খা টানিয়া একটা লম্বা সেলাম করিয়া আনন্দ বলিল, "বাহবা কি বাহবা—চাচা, কত ঢঙই জান! কিন্তু ঢঙে দুনিয়া ভোলে না চাচা, এই চাচী কি ভুলেছে ?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাদির শাহ

সেটা মোগলের অধঃপতনের যুগ। তৈমুরের বংশের শেষ প্রকৃত বাদশাহ মহম্মদ শাহ তখন ময়ুর সিংহাসনে উপবিষ্ট। কিন্তু গুজরাট ও মালব দেশ তখন মারাঠারা জয় করিয়া লইয়াছে। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমদনগর, বুরহানপুর, ইলিচপুর, খান্দেশ প্রথম নিজাম উল-মুলক চিন কিলীচ-খাঁর অধীনে স্বাধীন হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে ভাগ্যচক্রের বিপর্য্যয়ে পারস্যের প্রবল প্রতাপ অধিপতি নাদির শাহের কতকগুলি আফগান প্রজা পরাজিত হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের কাবুল সুবায় আশ্রয় লইল। আফগানরা যাহাতে মোগল সাম্রাজ্যে আশ্রয় না পায় এই অনুরোধ করিয়া নাদির শাহ ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার জয় করিবার পূর্ব্বেই দিল্লীতে দুইজন দূত পাঠাইয়া ছিলেন। বাদশাহ মহম্মদ শাহও নাদির শাহের অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুসারে পরাজিত আফগানদিগকে কাবুল ও গজনী চাকলায় প্রবেশ করিতে না দিবার আদেশ প্রেরণ করিবার অবসর বাদশাহ মহম্মদ শাহের ছিল না। কারণ নর্ত্তকী নূরবাই তখন বড় সুন্দর নাচিত।

আফগানরা মোগল সাম্রাজ্যে আশ্রয় পাইলে নাদির শাহ মহম্মদ শাহের কাছে তৃতীয় দূত পাঠাইলেন। মোগল

বাদশাহের পরামর্শদাতারা বুঝিলেন যে পারস্য সম্রাটের দূতকে উত্তর না দিয়া দিল্লীতে আবদ্ধ রাখিলেই রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইবে। এক বৎসর কাটিয়া গেল। দূত ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া নাদির শাহ মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

তখনও নূরবাই অতি সুন্দর নাচিতেছিল। কোকীজীউ গোপনে বাদশাহকে প্রেমের গান শিখাইতেছিল। সুতরাং গোলন্দাজরা কামান ছোড়া ভুলিয়া গিয়াছিল। বারুদ তৈয়ার করা একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল। আওরঙ্গজেব—আলমগীরের প্রেমের দায়ে হিন্দুরা অনেকদিন পূর্ব্বে মোগলের রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। সুতরাং আফগানিস্থান জয় করিতে নাদিরের বিশেষ বিলম্ব হইল না। কাবুল সুবার সুবাদার পাঁচ বৎসর নিজের সৈন্যদলের বেতন দিতে পারেন নাই। তিনি বাদশাহের নিকট টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। বাদশাহের উজীর খান দৌরান আমীর-উল-উমরা বলিয়া পাঠাইলেন যে বাঙ্গালায় সুবাদারের কাছে টাকা চাহিয়া পাঠাইতেছি। সেই টাকা আসিলেই কাবুলে পাঠান হইবে। উত্তর আসিবার পূর্ব্বে নাদির শাহ কাবুল জয় করিয়া বসিল।

লাহোরের সুবাদার জাকারিয়া খাঁ উজীরের প্রিয়পাত্র ছিলেন না। নাদির শাহ পেশাওর জয় করিয়া লাহোরের দিকে অগ্রসর হইলে তিনি লাহোর দুর্গ অবরোধের জন্য

প্রস্তুত হইলেন। জাকারিয়া খাঁ উজীরের মনের অবস্থা জানিতেন তিনি কুড়ি লক্ষ রজতমুদ্রা দিয়া লাহোর নগর ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিলেন।

লাহোর জয় করিয়া নাদির শাহ শুনিতে পাইলেন যে মোগল বাদশাহ মহম্মদ শাহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। পেশাওর জয় হইয়াছে শুনিয়া মহম্মদ শাহ ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে সাম্রাজ্যের তিন জন প্রধান কর্ম্মচারী ইতমাদ-উদ-দৌলা, কমর-উদ-দান খাঁ উজীর, নিজাম-উল্-মুল্ক আসফ জাহ উকীল, সম্‌সাদ্-উদ্-দৌলা খান দৌরানকে এক ক্রোর টাকা দিয়া নাদির শাহের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহারা এক মাসের মধ্যে দিল্লানগর পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। দুর্দ্দশায় পড়িয়া বাদশাহ রাজপুত রাজাদের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলেন। এমন কি মোগলের চিরশত্রু পেশবা বা প্রথম বাজীরাওয়ের নিকটেও দূত গেল। কিন্তু কেহই আসিল না। ১৮ই জানুয়ারী তারিখে মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী তিনজন পাণিপথ নগরে পৌছিলেন। তাঁহারা বাদশাহের আগমন প্রতীক্ষায় নয় দিন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। ২৭শে জানুয়ারী তারিখে বাদশাহ মহম্মদ শাহ যখন পাণিপথে পৌছিলেন তখন লাহোর নাদির শাহের হস্তগত। নিজামের অনুরোধে বাদশাহ পারসিক সেনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কর্নাল নগরের নিকট একটি মৃণ্ময় দুর্গ তৈয়ার করিবার আদেশ দিলেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাত্র ৪০ হাজার অশ্বারোহী লইয়া নাদির শাহ কর্নালে পৌঁছিলেন। তখন মোগল শিবিরে ৭৫ হাজার সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। নাদির মোগল সৈন্যকে মৃণ্ময় দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া দিল্লীর রাজপথ অধিকার করিয়া বসিলেন। তখন বাধ্য হইয়া মোগল বাদশাহকে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে হইল।

অনেক দিন তোপ তৈয়ারী হয় নাই। সুতরাং মহম্মদ শাহের ৮ হাজার তোপ নাদির শাহের সৈন্য পর্য্যন্ত পৌঁছিল না। সাদৎ খাঁ অযোধ্যা হইতে আসিবার পথে নিজের তৈজস পত্র পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি কর্নালে পৌঁছিবার পরে পারসিক সৈন্য তাঁহার অরক্ষিত আসবাব পত্র লুঠিয়া লইল। উপদেশ না শুনিয়া তিনি নিজের সম্পত্তি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে বাহির হইলেন। বাদশাহের আদেশে খান দৌরান তাঁহাকে সাহায্য করিতে গেলেন। অবশেষে বাদশাহ স্বয়ং মৃণ্ময় দুর্গের বাহিরে আসিলেন। এই অবসরে নাদির শাহ দুর্গের বাহিরে মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সাদৎ খাঁ বন্দী হইলেন। খান দৌরান আহত ও বাদশাহ মহম্মদ শাহ পরাজিত হইলেন। নাদির শাহের সহিত মোগলের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল।

সম্রাটের পরাজয় সংবাদ যখন দিল্লীতে পৌঁছিল, তখন দিল্লীর চারিদিকে লুঠতরাজ আরম্ভ হইল। পথ ঘাট বন্ধ হইয়া গেল। দিল্লীর মত বড় সহরে খাদ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে না। সুতরাং দ্বিতীয় দিন হইতেই

দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। আহীর গোয়ালারা সহরে দুধ আনা বন্ধ করিল। সবজীমণ্ডীর বাজার বন্ধ হইয়া গেল। বণিয়ারা একদিনে চাউল ও আটার দর দশগুণ চড়াইয়া বসিল। যে সমস্ত লোক দিল্লীর নগর প্রাচীরের বাহিরে বাস করিত, তাহারা আত্মরক্ষার জন্য বারুদ ও গুলী সঞ্চয় করিতে লাগিল। দিল্লী সহরের কোতোয়াল হাজী ফুলাদ খাঁ সহরের পাহারা বাড়াইয়া দিলেন। লোকজন বাহিরে যাওয়া এবং ভিতরে আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। দিল্লী সুবার সুবাদার লুৎফ উল্লা খাঁ সাদিক নগর রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে কর্নালের যুদ্ধের পর বারো দিন কাটিয়া গেল।

দিল্লীর লোক শুনিল যে সাদৎ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় বাদশাহ নাদির শাহের বন্দী হইলেন। নাদির শাহ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লইয়া কর্নাল হইতে পারস্যে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বাদশাহের দরবারে নিজামের প্রতিপত্তি দেখিয়া ঈর্ষ্যা পরবশ সাদৎ খাঁ পারস্যরাজকে মহম্মদ শাহকে বন্দী ও দিল্লী অধিকার করিতে পরামর্শ দিলেন। সাদৎ খাঁর পরামর্শে নাদির শাহ মহম্মদ শাহকে বন্দী করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন।

তখন দিল্লীর লোক স্তম্ভিত হইয়া গেল। চোগতাই সম্রাটের সৈন্যদল যে এত অন্তঃসারশূন্য, মোগল সম্রাটের মুসলমান সেনাপতিরা যে এতদূর বিশ্বাসঘাতক, তুলনায় পারস্যরাজের কিজিলবাশ অশ্বারোহী যে এত প্রবল, তাহা দিল্লীর লোক একেবারেই বুঝিতে পারে নাই। ইরাণী সৈন্য

যখন দিল্লীর নগরদ্বারে দেখা দিয়াছিল, তখনও হিন্দুস্থানী মুসলমানদের চৈতন্য হয় নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল যে ইরাণীরা দস্যু, তাহারা লুঠ করিতে আসিয়াছে, লুঠ করিয়া চলিয়া যাইবে। যদি বেশীদিন থাকিতে চাহে, তাহা হইলে বাদশাহী ফৌজ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে। যখন গুজরাট গেল, তখন গুজরাটে যে কয়জন মুসলমান আমীরের জায়গীর ছিল, তাহারাই কিছুদিন হা-হুতাশ করিয়া বেড়াইল। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে যখন মালব গেল, তখন দিল্লীতে অন্নহীন আমীরের সংখ্যা বাড়িল বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানী মুসলমানের চৈতন্য হইল না।

যখন নাদির শাহ কাবুল আক্রমণ করিল, তখন হিন্দুস্থানের মুসলমান ভাবিল যে বাদশাহী ফৌজ দুইদিনেই ইরাণের বাদশাহকে তাড়াইয়া দিবে। ক্রমে কাবুল গেল, পেশাওর গেল, লাহোর গেল। তখন হিন্দুস্থানী মুসলমান সাজিতে আরম্ভ করিল। বুদ্ধির সহিত যে পাশব বলের যুদ্ধ চলে না, কামানের সহিত যে তীর-ধনুক লইয়া যুদ্ধ হয় না, অষ্টাদশ শতাব্দীর শত্রু যে তলোয়ার ছাড়িয়া বাহুযুদ্ধ করে না, হিন্দুস্থানী মুসলমানের স্থূল মস্তিষ্কে এ কথা প্রবেশ করে নাই। তখনও নূর বাঈ নাচিত। মৌলাব খান খেয়াল গাহিত। প্রাসাদে নিত্য প্রভাতে দরবার ও সন্ধ্যাকালে মজ্‌লিস বসিত। তামাকের দোকানে, সরবতের দোকানে, কসবীর দেওয়ানখানায় হিন্দুস্থানী মুসলমান জওয়ান মরদরা মুখে ইরাণ, তূরাণ, শাণ ও রুম ফতে করিত আর বলিত, নাদির

শাকে জুতাপেটা করিয়া বাহির করিয়া দিব। আর সঙ্গে সঙ্গে লাহোর ও পেশাওর বেড়াইয়া আসিব।

মহম্মদ শাহের পরাজয় বার্ত্তা ও নাদির শাহ্ কর্ত্তৃক তাহার বন্ধন সংবাদ দিল্লীর নাগরিককে স্তম্ভিত করিয়া দিল। আওরঙ্গজেব—আলমগীরের মৃত্যুর বত্রিশ বৎসর পরে যে মহানগরী দিল্লী শত্রুর হস্তগত হইবে, একথা হিন্দুস্থানের মুসলমান স্বপ্নেও ভাবে নাই। দিল্লার নাগরিকরা শুনিল যে কিজিলবাশ হিন্দুর স্ত্রী ও মুসলমানের স্ত্রীতে কোন প্রভেদ দেখে না। তখন বাক্যের ছটা ভুলিয়া হিন্দুস্থানী মুসলমান আত্মরক্ষার জন্য আকুল হইয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লচ্ছেদার রাবড়ী

চারি হাজার সওয়ার লইয়া বিশ্বাসঘাতক অযোধ্যার নবাব সাদৎখাঁ যে দিন নাদির শাহের আদেশে দিল্লী সহরের বাহিরে ছাউনি করিল, সেই দিন দিল্লীর লোক প্রভাতে ফকির সুলতান লুৎফ উল্লা শাহের আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। পাহাড়গঞ্জ হইতে চাঁদনীচক পর্য্যন্ত সকলেই লুৎফ উল্লাকে চিনিত এবং তাহার তাবিজের জোর ছিল বলিয়া তাহাকে ভয় করিত। প্রভাতে ফতেপুরী বাজারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি বড় ভাড় হাতে করিয়া লুৎফ উল্লা যখন চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ইন সা আল্লাহ, দীন্, দীন্—ভাই সকল, আমার কথা শোন, পয়গম্বর আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন। যেমন করিয়া হউক ধর্ম্ম-রক্ষা করিতে হইবে" তখন দিল্লীর লোক চমকিত হইল। লুৎফ উল্লাকে সকলেই আফিমচী বলিয়া জানিত। নেশা ছুটিয়া যাইবার ভয়ে সে কখনও উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিত না। সুতরাং ফতেপুরী মসজেদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে সমস্ত মুসলমান তাহার কথা শুনিল, তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। লোকে জানিত যে লুৎফ উল্লা তাবিজ ও দোয়া বেচিয়া খায়। তাহার লচ্ছেদার রাবড়ী ও আফিমের খরচ চলিয়া গেলে সে আর রোজগার করিতে চাহে না। যাহারা লুৎফ উল্লাকে চিনিত, তাহারা ঠাহর করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যাহারা

চিনিত না, তাহারা ভাবিল যে আল্লা দিল্লীর নাগরিকের দুর্দ্দিনে সত্য সত্যই বুঝি দয়া করিয়াছেন।

সে দিন ফতেপুরী বাজার প্রায় পরিষ্কার। কেবল দুই একখানা দোকান খুলিয়াছিল, তাহাতেও ক্রেতা ছিল না। যে দুই চারিজন লোক পথে চলিতেছিল তাহারাও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু লোকের মন এত খারাপ হইয়াছিল যে তাহারা লুৎফ উল্লার কথা শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। একে ভয়ে দিল্লীর লোক তখন এক মনে ঈশ্বরকে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সুতরাং সকলেই ভাবিল যে ঈশ্বর বা আল্লাহ এই গুলিখোর ফকিরের মুখ দিয়া নিজের কথাই বলাইতেছেন। চারিদিকের লোক আসিয়া ফতেপুরী মসজেদের পূর্ব্ব দরওয়াজায় লুৎফ উল্লাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুৎবেগে ফতেপুরী বাজারের চারিদিকে প্রচার হইয়া গেল, "আল্লাহ রহম করিয়াছেন, লুৎফ উল্লা শাহ ফতেপুরী মসজেদের উপরে দৈববাণী করিতেছে।" দেখিতে দেখিতে দোকান পসার, কাটরা ও কুটীরের দুয়ার খুলিয়া গেল। দলে দলে ভীত ত্রস্ত নরনারী লুৎফ উল্লাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তখন লুৎফ উল্লা বলিতে আরম্ভ করিল,—

"তোরা এত দিন বাদশাহের বাদশাকে ভুলেছিলি। তাই আল্লাহ্ মহম্মদ শাহের দুর্দ্দশা দেখাইয়া তোদের চেতনা ফিরাইয়া আনিলেন। এখন অনুতাপ কর। মনের ময়লা ধুয়ে ফেল। ঈশ্বর একজন; মহম্মদ তাঁর নবী। আল্লাহের দয়া অপরিসীম। তিনি তোদের কাতর প্রার্থনা শুনে দয়া করেছেন। আমাকে

স্বপ্ন দিয়েছেন। ইরাণী মুসলমান শীয়া—শীয়াকে কাফের বললেও চলে।"

চারিদিকে সুন্নীরা উৎসাহে চিৎকার করিয়া উঠিল। উৎসাহ পাইয়া লুৎফা উল্লা শাহ বলিতে আরম্ভ করিল,—"বাদশাহ কে? ঈশ্বরের দাসানুদাস মাত্র। যে বাদশাহ প্রজাকে রক্ষা করিতে পারে না, সে বাদশাহ হবার যোগ্য নয়। খোদা তালা সেই জন্য মহম্মদ শাহের বাদশাহী ঘুচিয়ে দিয়েছেন। আজ দিল্লীতে বাদশাহী নাই। দিল্লীর বাদশাহী আল্লা আমাকে দিয়েছেন।"

যাহারা লুৎফ উল্লা শাহকে আফিমচী বলিয়া জানিত, তাহারা ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দুই এক জন অস্পষ্টস্বরে বলিল,"শাহ সাহেব আফিমের মাত্রা চড়িয়েছে দেখছি।" তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন লুৎফ উল্লা বলিয়া উঠিল, "মনে করেছ আমি আফিমের মাত্রা চড়িয়েছি। ভুল, তোমাদের ভয়ানক ভুল। তিন দিন বাজারে দুধ আসে নি। সোনার টাকা দিয়ে রাবড়ী পাওয়া যায় না। তা আর খাব কি? খোদাকে তোমরা যেমন প্রাণ ভরে ডেকেছিলে, আমিও রাবড়ীর অভাবে সেই রকম প্রাণ ভরেই ডেকেছিলুম। সুতরাং আজ আর আমার রাবড়ীর অভাব নেই।" লুৎফ উল্লা হাতের ভাঁড় হইতে এক মুঠা সরেস লচ্ছা লইয়া নিকটের একটা কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাহার হাতে রাবড়ীর রস দেখিয়া দিল্লীর লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

দিল্লী সহরের কোতোয়াল ফুলাৎ খাঁ তখন কোতোয়ালীর সওয়ার লইয়া সহরে বাহির হইয়াছিলেন। ফতেপুরী মসজেদের

সম্মুখে লোকারণ্য দেখিয়া, তিনি পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন,"এখানে কি হচ্ছে ?"

নাগরিক উত্তর দিল, "ফকির শাহ লুৎফ উল্লা দৈববাণী করছেন।"

ফুলাৎ খাঁ লুৎফ উল্লা শাহকে চিনিতেন না। কিন্তু দিল্লীর ইতর ভদ্র সকলেই তাঁহাকে চিনিত। দৈববাণী শুনিবার জন্য ফুলাৎ খাঁ ভিড় ঠেলিয়া ঘোড়া চালাইলেন। তাঁহাকে পথের লোক সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। ফুলাৎ খাঁকে নিকটে আসিতে দেখিয়া লুৎফ উল্লা চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে ফুলাৎ খাঁ, তোর বাদশাহের বাদশাহী ফুরিয়েছে। আজ আল্লাহের রহমে আমি দিল্লীর বাদশাহ।"

ফুলাৎ খাঁ দিল্লীর মুসলমান ফকিরদের চিনিতেন। মোগল সাম্রাজ্যের এই দুর্দ্দিনে প্রকাশ্য রাজপথে লোকপ্রিয় ফকিরের অপমান করিতে তিনিও ভরসা করিলেন না। ফুলাৎ খাঁ দূর হইতে অপরিচিত লুৎফ উল্লা শাহকে সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া অন্য পথে অশ্ব চালাইয়া দিলেন।

এক ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া লুৎফ উল্লা যখন থামিল, তখন দিল্লীর মুসলমানরা "দীন্-দীন" বলিয়া চিৎকার করিয়া পুরাতন ফতেপুরী মস্জেদ কাঁপাইয়া তুলিল। সে যখন গৃহে ফিরিল তখন দলে দলে মুসলমান তাহার সঙ্গে ছুটিল। তাহাকে গৃহদ্বারে পৌছাইয়া দিয়া দিল্লীর লোক নূতন উৎসাহে গৃহে ফিরিয়া গেল।

আনন্দরাম যখন ফকির শাহ স্থলতান লুৎফ উল্লার বেশ ধারণ করিয়া আসল লুৎফ উল্লার গৃহের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল, তখন আসল লুৎফ উল্লা নকলটিকে চিনিতে না পারিয়া কহিল, "আদাব, কি হুকুম ?"

আনন্দরাম হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ফকির সাহেব, একেবারে চিন্‌তেই পারলে না যে ?"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আসল লুৎফ উল্লা ভয়ে ও আশ্চর্য্যে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। তাহা দেখিয়া আনন্দরাম বলিল, "হাতে কি বল দেখি ?"

লুৎফ উল্লা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ?"

"লচ্ছেদার রাবড়ী।"

"মাইরি ?"

আনন্দরামের অনুমতি না লইয়াই লুৎফ উল্লা ভাঁড়টা কাড়িয়া লইয়া তাহাতে একটা চুমুক দিল। তারপর মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "তোফা, ইয়া আল্লা। জিতা রহো, বাঙ্গালী রাজা।"

আনন্দে লুৎফ উল্লা শাহ সে দিন দাঁতন করিতে ভুলিয়া গেল। জলে আফিমচীর বিশেষ ভয়। স্থতরাং স্নান বা শৌচ পরিত্যাগ করিতে তাহার বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না। আনন্দরামকে বিশেষ কথা কহিবার অবসর না দিয়া আদৎ লুৎফ উল্লা রাবড়ীর ভাঁড়টি লইয়া ধীরে ধীরে তাহার অন্ধকার কোটরে প্রবেশ করিল। তাহা দেখিয়া আনন্দরাম তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। লুৎফ উল্লা আফিমের ধূম পানের

চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ফকির সাহেব, ইরাণের বাদশাহ সুন্না ফকির দেখলেই জবাই করবার হুকুম দিচ্ছেন। তুমি সাবধান, যেন খবরদার বেরিও না।"

উভয় উরুতে প্রচুর পরিমাণে রস মাখাইয়া, লম্বা বাঁশের নলটি মুখে দিয়া লুৎফ উল্লা তখন চিমটায় করিয়া একটা জ্বলন্ত অঙ্গার ছিটার উপরে ধরিতেছিল। সে নলটি নামাইয়া বলিল, "বহুৎ আচ্ছা, মাশা আল্লা, রাবড়ীটুকু খতম হলেই বাস্। তারপর ইরাণী সুলতান জবা করুক বা কোরবানি করুক, আমার কোনই আপত্তি নেই।" আনন্দরাম দ্বিতীয় কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই প্রজ্বলিত কালাচাঁদের প্রভাবে শাহ সাহেবের মাথাটা লুটাইয়া পড়িল। আনন্দরাম বুঝিল যে, বিষম বিপদ উপস্থিত হইলেও ফকির শাহ সুলতান লুৎফ উল্লা দুই একদিনের মধ্যে নড়িতে পারিবে না। সে তখন নিশ্চিত মনে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেল।

দাড়ি খুলিয়া, হাত মুখ ধুইয়া বাঙ্গালী সাজিয়া আনন্দরাম আবার যখন বাহির হইল, তখন দিল্লীর পথে পথে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকলেরই মুখে এক কথা—বাদশাহ কয়েদ হইয়াছেন। ইরাণী ফৌজ আসিতেছে। ইরাণী বাদশাহ আসিতেছেন। মুসলমানরা বিশেষতঃ শীয়ারা আনন্দে অধীর। হিন্দুদের মুখ শুষ্ক হিন্দুদের মধ্যে মারাঠারা ভয়ে পথে বাহির হইতে চাহে না। আনন্দরাম চাঁদনী চৌক ছাড়াইয়া গোলাপী বাঈয়ের বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলার নবাব পুত্র

যে যুগে মুসলমান মাত্রেই বিশ্বাসঘাতক ছিল, সে যুগে মুসলমান কর্ম্মচারী মুসলমান বাদশাহের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের বিশ্বাসঘাতক সাদৎ খাঁ মনে করিয়াছিল যে, সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইরাণী বাদশাহের প্রিয় হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নিজাম উল-মুলকের সর্ব্বনাশ করিবে। কিন্তু নিমক হারাম এবং নিমক হালালের ঈশ্বর এক হওয়ায় সাদৎ খাঁর সুবর্ণ মুষ্টি ধূলিমুষ্টি হইয়া গেল। বৃদ্ধ নিজাম উল্ মুল্‌ক্ নাদির শাহকে বুঝাইয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়া কুর্নাল হইতে ইরাণ দেশে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু নিমকহারাম সাদৎ খাঁ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, দিল্লীতে গেলে তিনি অর্দ্ধ ক্রোরের পরিবর্ত্তে শত ক্রোর পাইবেন। নাদির শাহ বন্দী মহম্মদ শাহকে লইয়া দিল্লী চলিলেন। আগে আগে চার হাজার সওয়ার ছাতি ফুলাইয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিল। দিল্লীর ফৌজদার লুৎফ উল্লা খাঁ প্রথমে দিল্লী রক্ষা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু নিমকহারাম সাদৎ খাঁ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে জগৎ বিজয়ী নাদির শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। হঠাৎ দিল্লীর সমস্ত মুসলমান একমত হইয়া উঠিল। শীয়া ও সুন্নী, হন্‌ফী ও সুফী একত্র হইয়া সকল বাদশাহের বাদশাহ

ইরাণের বাদশাহকে রাজধানীতে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানে যে হিন্দু বলিয়া একটা জাতি আছে, তাহা ভুলিয়া গেল। কোতোয়াল ফুলাৎ খাঁ ও ফৌজদার লুৎফ উল্লা খাঁ চেষ্টা করিয়া এতদিন দিল্লা সহরের মধ্যে গোলমাল হইতে দেন নাই। সাদৎ খাঁ আসিয়া পৌছিলে তাহাদের সাহস বাড়িয়া গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা ভয় পাইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। সহরের প্রাচারের বাহিরে যাহারা বাস করিত, তাহারা মুসলমান গুণ্ডাদের ভয়ে ঘর দুয়ার বন্ধ করিয়া বারুদগুলী কিনিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। নিকটে আগ্রা, মথুরা, ঢোলপুর বা গোয়ালিয়রে যাহাদের আশ্রয় ছিল তাহারা পলাইয়া বাঁচিল। কিন্তু দিল্লী সহরের প্রাচারের ভিতর হইতে হিন্দুরা অধিক সংখ্যায় পলাইতে পারিল না। তখন মুসলমান গুণ্ডারা তাহাদের পাইয়া বসিল।

হিন্দু বণিয়া দোকান খুলিলে চারিদিক হইতে মুসলমান গুণ্ডারা আসিয়া অনুগ্রহ করিয়া তাহার জিনিষপত্র যতদূর পারিত, বিনামূল্যে লইয়া যাইত। আর অবশিষ্ট আল্লার নাম করিয়া পথের ধূলায় ছড়াইয়া দিত। গরুটা মহিষটা পথে বাহির হইলে আর ফিরিত না। ক্রমে ডুলি করিয়া মহিলাদের পথে বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া গেল। মুসলমান গুণ্ডাদের অত্যাচারে মুসলমান ভদ্রলোকরা পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বাজারে দোকান পাট বন্ধ হইয়া গেল। খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায় না। ঘৃত বা দুগ্ধ অনেক দিন হইতেই

সহরে আসে না। ক্রমে মৎস্য ও মাংসও বন্ধ হইয়া গেল। তখন বাধ্য হইয়া ফৌজদার লুৎফ উল্লা খাঁ এবং বিশ্বাস ঘাতক সাদৎ খাঁ মুসলমান গুণ্ডাদের শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। চাঁদনী চকের পশ্চাতে একটা প্রকাণ্ড কাটরার সম্মুখে ত্রিশ চল্লিশ জন মুসলমান গুণ্ডা মশাল জ্বালিয়া হল্লা করিতেছিল। তাহাদের "দীন্ দীন্" রবে পুরাতন কাটরা কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কাটরার দুয়ার তখন বন্ধ এবং তাহাব পাশে দাঁড়াইয়া ছয় হাত লম্বা একখানা পাকা বাঁশের লাঠি হইয়া একজন দার্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালী লাঠিয়াল পাহারা দিতেছিল। আর ত্রিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া তলোয়ার হাতে লইয়া বৃদ্ধ কালে খাঁ ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দরাম বুঝিল যে গুণ্ডারা গোলাপীর গৃহ লুঠ করিতে আসিয়াছে। ফকিরের বেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহার মনে একবার দুঃখ হইল। কিন্তু সে দুঃখ ক্ষনেকের জন্য। সে তখনই একটা সরু গলির ভিতরে গিয়া কাপড়টা আঁটিয়া পরিয়া লইল। উড়ানীখানা পাগড়ী করিয়া মাথায় বাঁধিল। কাপড়ের ভিতরে একখানা বড় ছোরা ছিল। আনন্দরাম সেখানা দাঁতে ধরিয়া গলি দিয়া কাটরার পিছনে চলিয়া গেল। সে দিকে একটা ছোট দুয়ার ছিল। সে দুয়ারে আঘাত করিবামাত্র একটি রমণী ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বরে তাহাকে চিনিতে পারিয়া আনন্দরাম অতি ধীরে ধীরে কহিল, "ওরে, আমি আনন্দরাম।" কিন্তু তাহাতে ফল

বিপরীত হইল। রমণী চিৎকারের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। তখন দুয়ারের পিছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। আনন্দরাম বুঝিল যে, আর একজন কেহ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। সে ভরসা পাইয়া বলিল, "আমি আনন্দরাম, ভয় নেই, তুমি কে ?"

যে আসিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে আনন্দরাম, তা কেমন করে বুঝবো ?"

আনন্দরাম বলিল,—"গোলাপী দিদি, সত্য সত্যই আমি আনন্দরাম। তুমি দুয়ার খোল। ভয় নেই।"

দুয়ার খুলিতেই আনন্দরাম ভিতরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। গোলাপী ভয়-বিহ্বলা হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। আনন্দরামের ছোরা লাগিয়া তাহার একটা কানের খানিকটা কাটিয়া গেল। আনন্দরাম তাহাকে শান্ত করিয়া উপরে লইয়া গেল। কিন্তু দুয়ারের পাশে বসিয়া প্রথম রমণী একটি মুসলমানী বাঁদী পূর্ব্বের মত চিৎকার করিতে লাগিল। গুণ্ডারা তখনও দুয়ার ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে নাই। কারণ অন্ধকার তখনও ঘন হয় নাই। বারন্দার নীচে হইতে আনন্দরাম অস্ফুটস্বরে কালে খাঁকে বলিল, "খাঁ সাহেব, এদের কতক্ষণ রুখতে পারবে ?"

কালে খাঁ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিল,—"রুখতে পারবো এক লহমাও নয়। ফটকটা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আশা। তার পর খোদা তালার মরজী।"

গোলাপীকে দুইটা মুসলমানী স্ত্রী ও দুইটা পুরুষের পোষাক স্থির করিতে বলিয়া আনন্দরাম নীচে নামিয়া গেল।

তাহার পায়ের শব্দ পাইয়াই লাঠিয়াল জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে ?"

আনন্দরাম অতি ধীরে ধীরে কহিল, "আমি আনন্দরাম। গুণ্ডাদের কতক্ষণ রুখতে পারবি ?"

লাঠিয়াল বলিল, "তুয়ারটা যদি না ভাঙ্গতে পারে তাহলে তু'দণ্ড লড়তে পারি, বাপু।"

"বাহাত্বর বনমালী, আজ নিমকের পরিচয় দিতে হবে। আমি সকলকে নিয়ে খিড়কী দরজা দিয়ে স'রে পড়ছি। পিছনের গলি থেকে একটা শিস্ দেব তখন লাঠিখানা নিয়ে তুই সরে আসিস্।"

এই সময় একজন মুসলমান কাটরার প্রাচীরের উপরে উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বনমালীর অব্যর্থ লাঠির আঘাতে সে তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইল। বাহিরে গোলমাল বাড়িয়া উঠিল। আনন্দরাম ধীরে ধীরে সর্পের মত অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নুর বাঈ

কর্ণালের যুদ্ধে মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহের পরাজয়ের প্রধান কারণ নর্ত্তকী নুর বাঈ। নূর বাঈ তন্বী, অপরূপ সুন্দরী, পূর্ণ যুবতী। লোকে বলিত যে তাহার বর্ণ গোলাপের মত। তাহার সূক্ষ্ম চর্ম্মের ভিতর হইতে যৌবন-চঞ্চল রক্তধারা স্পষ্ট প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। তাহার কণ্ঠে সৃষ্টিকর্ত্তা সুধা ও মাদিরার অফুরন্ত ভাণ্ডার নিবেশ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং সুন্দরী যুবতী নূর বাঈ সুগায়িকা। সে তাহার নৃত্য ও গীতের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে বাদশাহ মহম্মদ শাহ হইতে দিল্লীর রাজপথের ভিখারী পর্য্যন্ত সকলকে সমান ভাবে তাহার গোলাম করিয়া রাখিয়াছিল।

দুষ্ট লোক বলে যে নূর বাঈকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া শম্ শম্-উদ্দৌলা দুই মাসের মধ্যে দিল্লী ছাড়িয়া লড়াই করিতে বাহির হইতে পারিলেন না। প্রাসাদে সে দিন নূর বাঈয়ের মুজরা হইতেছিল বলিয়া লাহোরের সুবাদার জাকারিয়া খাঁ সাহায্য পাইল না। সুতরাং সে বেচারা হতাশ হইয়া নাদির শাহকে লাহোর সহর ছাড়িয়া দিল। সেই দিন সন্ধ্যার পরে রূপসী নূর বাঈ তাহার দ্বিতল প্রাসাদের বারান্দায় বসিয়া সেতারে আলাপ করিতেছিল। সহসা তাহার বাঁদী আগন্তুকদের ডাকিয়া আনিল। মুসলমানী বেশে

গোলাপী, স্ত্রীবেশে সাহেবজাদা আক্রম জমান খাঁ ও মুসলমানবেশী আনন্দরাম ও বনমালী গৃহে প্রবেশ করিল। গোলাপী আত্মবিস্মৃত হইয়া নূর বাঈয়ের পা জড়াইয়া ধরিল। তারপর সে বাঙ্গলায় যাহা বলিল কাশ্মীরী নর্ত্তকী তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া আনন্দরাম ফার্সীতে সকলের পরিচয় দিয়া গোলাপীর কথা বুঝাইয়া দিলেন।

সেটা ইংরেজী ১৭৩৯ সাল। তখন বাঙ্গলার সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইয়াছে। সুজাউদ্দৌলা মৃত্যুর পূর্ব্বে দীর্ঘকাল মুর্শিদকুলী খাঁর কন্যার মুখদর্শন করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খাঁ পিতার নিকট মুর্শিদাবাদে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আক্রম জমান খাঁ প্রাণভয়ে দিল্লীতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। আসিবার সময় সুযোগ্য সাহেবজাদা মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠ হইতে রূপবতী ব্রাহ্মণ বিধবা গোলাপীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

আগন্তুকদের পরিচয় পাইয়া নূর বাঈ স্তম্ভিত হইয়া গেল। মোগল বাদশাহ কর্নালের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহারই মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীতে যে বাঙ্গলার সুবাদারের পুত্র আক্রম জমান খাঁর এইরূপ দুরবস্থা হইতে পারে, তাহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। আনন্দরাম তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সাহেবজাদা ও গোলাপীর জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। তিনি অনেক

কষ্টে নূর বাঈকে তাহাদের আশ্রয় দিতে রাজী করিয়া বনমালার সহিত পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সে রাত্রিতে দিল্লীতে রাজপথের অবস্থা দেখিয়া বাঙ্গালী আনন্দরাম স্তম্ভিত হইয়া গেল। সমস্ত দিল্লীর রাজপথ জনশূন্য ও অন্ধকার। স্থানে স্থানে লুণ্ঠিত দোকানের সমস্ত দ্রব্য পথে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। গুণ্ডারা কোন কোন স্থানে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। ভস্মাবশেষ তখনও ধীরে ধীরে জ্বলিতেছে। দূরে সময়ে সময়ে উন্মত্ত গুণ্ডাদের চিৎকার শুনা যাইতেছে। কিয়দ্দূর চলিতে চলিতে আনন্দরাম বুঝিল যে, বনমালী চলিতে পারিতেছে না। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে বনমালী, চল্‌তে পারছিস না কেন? জখম হয়েছিস্ না কি?"

বনমালী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বলিল, "আজ্ঞে না, পোষাকটা কামড়ে ধরেছে বটে।"

আনন্দরাম ফিরিয়া দেখিল যে, সাহেবজাদার বহু মূল্য চুড়িদার পায়জামা বনমালীর পদদ্বয় ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। আনন্দরাম জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে, বাসায় কি হচ্ছে বুঝতে পারা গেল না। তুই আর একটু জোরে চল্।"

বনমালা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বলিল, "আজ্ঞে, সেটিত আমারও ইচ্ছে, কিন্তু ইনি দেন কই? দা-ঠাকুর, অনুমতি করত, এনাকে ছেড়ে একবার রণপায়ে লাফিয়ে চলি?"

বনমালীর অবস্থা বুঝিয়া তাহার দীর্ঘ দেহের যে যে অংশ সাহেবজাদার বহুমূল্য চুড়িদার পায়জামা প্রবলভাবে আক্রমণ

করিয়াছিল, আনন্দরাম তাহা ছুরি দিয়া কাটিয়া দিল। বনমালীর পদদ্বয় মুক্তি পাইয়া বাঁচিল এবং সে একটা লম্ফ দিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিল। বনমালীকে দ্রুতপদে চলিতে বলিয়া আনন্দরাম অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে নিজের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদের মহল্লায় তখনও কোনরূপ গোলমাল আরম্ভ হয় নাই দেখিয়া আনন্দরাম নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

অনেকক্ষণ দুয়ারের কড়া নাড়িয়া এবং নিজের পরিচয় দিয়া তবে আনন্দরাম নিজের বাসায় ঢুকিতে পাইল। তাহারই এক ভৃত্য একটা মশাল হাতে লইয়া দুয়ার খুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। সে আনন্দরামের পশ্চাতে সম্রান্ত মুসলমান বেশী বনমালীকে দেখিয়া অভ্যাসবশতঃ একটি দীর্ঘ সেলাম করিল। বনমালী রাগিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে সদাই, তু নাপিতের ছেলে, আর আমি বাগ্‌দি, তু আমাকে পেন্নাম করিস্ কেনে?"

কথার আওয়াজে বনমালীকে চিনিতে পারিয়া সদানন্দ বলিয়া উঠিল, "বনমালীই ত বটে। তু বহুরূপী সেজেছিস্, তা আমি কেমন ক'রে জানব?"

বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া আনন্দরাম দেখিল যে, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ নানা প্রকারের গাভী ও বৎসে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে সদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "সদাই, এত গরু বাছুর কোথা থেকে এল রে?"

সদানন্দ বলিল, "আজ্ঞে, সহরে মুসলমান ক্ষেপেছে শুনে পাড়ার যত গরীব হিন্দু এই বাড়াটাই মজবুত ব'লে এখানে তাদের গরু বাছুর সব জিম্মা ক'রে গিয়েছে।"

সদানন্দ তাহার গৃহে বসিয়া সবেমাত্র তামাকু টানিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে লক্ষ্মীর পিতামহী আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন যে তিনি আনন্দরামের ভরসাতেই পল্লীবাসীর গরু বাছুরকে আশ্রয় দিয়াছেন।

আনন্দরাম কোন উপায় না পাইয়া বলিল যে, সে কি করিবে, তাহা প্রভাতে জানাইবে। গোলাপী, আক্রম জমান খাঁ, লক্ষ্মী, তাহার দিদি ও পিতামহীর সহিত শতাধিক গাভীর চিন্তা আনন্দরামকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাবড়ীর বাগিচা

প্রভাতে উঠিয়া আনন্দরাম বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় সে লক্ষ্মীকে বলিয়া গেল যে, তাহার আজ অনেকটা রাবড়ীর দরকার হইবে। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী যখন জিজ্ঞাসা করিল যে আন্দাজ কতটা লাগিবে, তখন আনন্দরাম বলিল, 'যতটা হয়।"

লক্ষ্মীর পিতামহী ও দিদি সকাল হইতে এক মণের অধিক দুধ জ্বাল দিতে বসিলেন। আনন্দরাম বাহির হইয়া গিয়া পুরাতন দিল্লীর নিকটে এক পরিচিত বেণিয়ার দোকান খোলাইয়া দুই তিন বস্তা সবুজ কাপড় কিনিল এবং তাহা সদানন্দ ও বনমালীর মাথায় চাপাইয়া বাসায় ফিরিল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। মহল্লার মুখে সে শুনিতে পাইল যে মুসলমান গুণ্ডারা সকলেই গরুর সন্ধান পাইয়া তাহার বাড়ী লুঠিতে আসিয়াছিল। কিন্তু পাড়ার হিন্দুরা মিলিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিয়াছে। তাহারা শাসাইয়া গিয়াছে যে সন্ধ্যার পরে তাহারা দলবল লইয়া ফিরিয়া আসিবে। তখন হিন্দুদের কে রক্ষা করে দেখা যাইবে!

পাড়ার মাতব্বর হিন্দুরা আসিয়া আনন্দরামের শরণাপন্ন হইল। সে যে বাঙ্গলার নবাবপুত্রের বন্ধু এবং একজন সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তি তাহা সকলেই জানিত। অনেকেই

শুনিয়াছিল যে বাদশাহের দরবারে তাহার যথেষ্ট খাতির আছে। আনন্দরাম তাহাদের আশ্বাস দিয়া বাসায় আসিল।

লক্ষ্মী দুই গাঁঠরী সবুজ রঙের কাপড় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল যে নিশ্চয়ই ঐ বাঙ্গালী বাবুজীর বিবাহ। তাহা না হইলে এত সবুজ কাপড় কি হইবে? কিন্তু লাল রঙের পরিবর্ত্তে সবুজ রঙের কাপড় কেন আসিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে সে আনন্দরামকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী, তোমার কি সাদী?"

আনন্দরাম গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "হুঁ।"

"কোথায়?"

আনন্দরাম আবার গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, যমের বাড়ী।"

"সে কোথায়?"

"খুব কাছে, লক্ষ্মী! আমাদের বাড়ীর ছাদের ওপর থেকে কেন—লক্ষ্মী, ইচ্ছা হ'লে এইখানে বসেই দেখা যায়।"

লক্ষ্মী ঘরের জানালা দিয়া যে কয়খানা বাড়ী দেখা যায়, তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কই, বাবুজী, কোন্ খানা যমের বাড়ী? এ সমস্ত বাড়ীই ত আমি চিনি।"

আনন্দরাম হাসিয়া উত্তর দিল, "লক্ষ্মী, যম যখন যেখানে যায়, সেইখানেই তখন তার বাড়ী হয়। হয়ত আজ সন্ধ্যাবেলাই তোমাদের বাড়ীই যমের বাড়ী হবে।"

তখনও লক্ষ্মীর সন্দেহ ঘুচিল না। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটির নাম কি বাবুজী?"

আনন্দরাম আবার হাসিয়া বলিল, "বাব্‌লা।"

লক্ষ্মী বুঝিতে না পারিয়া আনন্দরামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অপরাহ্ণে সদানন্দ গিয়া বুড়া কালে খাঁকে ডাকিয়া আনিল। আনন্দরাম অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্মীর পিতামহীর সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধ্যাকালে সমস্ত গরুর দুধ দুহিয়া বড় বড় চামড়ার বোতলে পুরিল। সন্ধ্যার পরে কালে খাঁ, সদানন্দ ও বনমালী সমস্ত গরু সারি সারি করিয়া বাঁধিল। প্রত্যেক সারিতে চারটি গরু এবং তাদের পিঠের ওপর একটি ছোট বাঁশ। বাঁশের উপর হতে সদানন্দ রাবড়ীপূর্ণ একটি বড় হাঁড়ি ঝুলাইয়া দিল। আনন্দরাম যতগুলি চামড়ার বোতল যোগাড় করিতে পারিয়াছিল, তাহাতে টাট্‌কা দুধ পুরিয়া গরুগুলির পিঠে ঝুলাইয়া দিল। এইরূপে পঁচিশ ত্রিশ সারি গরু নূতন সবুজ কাপড়ে যথাসম্ভব মুড়িয়া আনন্দরাম স্বয়ং লুৎফ উল্লা শাহ ফকির সাজিল। তারপর সাহেবজাদা আক্রম জমান খাঁর বহুমূল্য পোষাক দুইটা বনমালী বাগ্‌দী এবং সদানন্দ নাপিতকে পরাইয়া দিল। সাজগোজ এবং বন্দোবস্ত দেখিয়া বৃদ্ধ কালে খাঁ ঘন ঘন পানের পিচ্‌ ফেলিতে ফেলিতে বলিল, "তাজ্জব, বড় তাজ্জব, বাঙ্গালী জাত বড় হুঁসিয়ার। বাবুজী, মতলব আঁটিয়াছ ভাল। দুধের জন্য আজ দিল্লীর মহল্লায়

মহল্লায় হাহাকার পড়ে গিয়েছে। আজ বহুৎ টাকা রোজগার হবে।"

আনন্দরাম তাহার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিল।

আনন্দরামের সাজগোজ এবং আয়োজন দেখিয়া লক্ষ্মী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। আনন্দরাম যখন যাত্রা করিবে, তখন লক্ষ্মী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবুজী, তুমি কখন ফিরিবে? দিদি যে বড় কাঁদছে?"

আনন্দরামের চোখ দুইটি হঠাৎ জলে ভরিয়া উঠিল। স্বদেশ হইতে বহুদূরে, এই অপরিচিত পরিবারের মধ্যে অযাচিত স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল। মুখ ফিরাইয়া, চক্ষু মুছিয়া সে লক্ষ্মীকে বলিল, "বউ নিয়ে কাল সকালে আসব, লক্ষ্মী?"

লক্ষ্মী তাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া বলিয়া উঠিল, "মিথ্যে কথা, বাবুজী! দিদি বলেছে যে, বাবলা মানে যমুনাজীর ধারের শ্মশান ঘাটি। তুমি ত বিয়ে করতে যাচ্ছ না, তুমি হিন্দুর জন্য মরতে যাচ্ছ। তুমি যেও না বাবুজী! তুমি গেলে আমি বড় কাঁদব।"

আনন্দরাম আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে লক্ষ্মীকে কোলে তুলিয়া লইয়া দেখিল যে তাহার গোলাপের মত মুখখানি চোখের জলে ভরিয়া গিয়াছে। আনন্দরাম অনেক কষ্টে তাহাকে শান্ত করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

তখন কালে খাঁ, বনমালী ও সদানন্দ তিনটা মশাল জ্বালিয়া পথে দাঁড়াইয়াছে। আনন্দরামের ইঙ্গিত মত

মহল্লার হিন্দুরা সরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সামনে কালে খাঁ ও সদানন্দ আর পিছনে বনমালী গরুগুলি তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। গলির মোড়ে আসিয়া আনন্দরাম একটা বিকট চিৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। সে বলিল, "আল্লাহ করিম, খোদা মেহেরবান্, আল্লাহ এক, মহম্মদ তাঁর নবী।"

সেটা হিন্দুর মহল্লা। সুতরাং এ কথা শুনিয়া পথে কেহ বাহির হইল না। দুই একজন জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইল বটে, কিন্তু কেহ কিছু বলিল না। অদূরে দরিদ্র মুসলমান পল্লীতে প্রবেশ করিয়া আনন্দরাম চিৎকারের মাত্রা বাড়াইল। সে মহল্লায় মুসলমান তন্তুবায় ও জোলারা বাস করিত। অবরুদ্ধ দিল্লী তাহাদের পক্ষে যমালয়-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। দরিদ্র জোলারা অন্নাভাবে মরিতেছিল। দুধের অভাবে মায়ের কোলে প্রত্যহ শত শত শিশু চিরবিদায় লইতেছিল। আর তাহাদের অসহায় পিতামাতা মরণ-কাতর পুত্র কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বাদশাহ মহম্মদ শাহ ও তাঁহার উজীরকে অভিশাপ দিতেছিল।

সেই মহল্লায় আনন্দরাম বলিতে আরম্ভ করিল,—"খোদা মেহেরবান্, আল্লাহ্ আমাকে রহন্ করেছেন। আমি আফিমচী। দুধ অভাবে মরছিলাম। খোদা আমাকে রাবড়ীর বাগিচা দান করেছেন। সেই মেহেরবানের হুকুমে দুধের দরিয়া নিয়ে দিল্লীর পথে পথে বিলিয়ে বেড়াচ্ছি। কোন্ মুসলমানের দুধ চাই? কোন্ আফিমচীর রাবড়ী চাই?"

প্রথমে দরিদ্র তন্তুবায়রা আনন্দরামের কথা বিশ্বাস করিল না। কিন্তু সারি সারি গরু—তাদের পিঠে রাবড়ীর হাঁড়ি আর আনন্দরামের হাতে দুধের বোতল দেখিয়া শিশুর জননীরা অস্থির হইয়া উঠিল। এক বৃদ্ধ লজ্জার বাধা দূর করিয়া পাত্রহস্তে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। আনন্দরাম তাহার পাত্রটি দুধে পরিপূর্ণ করিয়া দিল। তাহা দেখিয়া পুরুষদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, পল্লীর শত শত রমণী দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন কালে খাঁ ও সদানন্দকে দুগ্ধ বিতরণ করিতে বলিয়া আনন্দরাম নিজে কেবল চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল,—"এ দুধ খোদার দান, সুতরাং কাফেরের হারাম। হিন্দু এ দুধ খাইলে মরিবে। এ দুধ কেবল শিশু ও বৃদ্ধের জন্য। জুয়াচুরী করিয়া কেহ লইলে খোদা তাহাকে সাজা দিবেন।"

যে সমস্ত মুসলমান গুণ্ডা সকালে আনন্দরামের বাসা লুঠিতে আসিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দূর হইতে মশালের আলো দেখিয়া ও চিৎকার শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। দুধ পাইয়া সমস্ত জোলা কৃতজ্ঞচিত্তে ফকিরের দোয়া লইতেছিল। সেখানে গুণ্ডারা ফকিরবেশী আনন্দরামকে আক্রমণ করিলে পিষিয়া যাইত। তাহারা বুদ্ধিমানের মত অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে ফিরিয়া গেল।

আনন্দরাম তখন বলিতেছিল, "বাদশাহ মহম্মদ শাহ কাফের। সে শিয়ার পায়ে মাথা রেখেছে। খোদা তাই

আমাকে হিন্দুস্থানের বাদশাহী দিয়েছেন। খোদার দয়া অপার। এ রাজ্যে আর কোন মুসলমানের দুঃখ থাকিবে না। কার দুধ চাই? কে আফিমচী আছ? আমি ফকীর লুৎফ উল্লা আফিমচী। রাবড়ী অভাবে মরতে বসেছিলাম। তাই খোদা আমাকে রাবড়ীর বাগিচা দিয়েছেন। কে আফিমচী আছ, নির্ভয়ে এগিয়ে এস।”

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিল্লীর দরিদ্র পল্লীগুলি আনন্দরাম ভাল রকম চিনিয়া রাখিয়াছিল। সে প্রতি পল্লীতে ফিরিয়া দুধ ও রাবড়ী বিতরণ করিয়া বেড়াইল। সারা দিল্লী শহরময় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। দরিদ্র মুসলমানরা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিল যে, অধর্ম্মাচারী মহম্মদ শাহের রাজ্য খোদা ফকির লুৎফ উল্লা শাহকে দিয়াছেন। দিল্লীর কোতোয়াল হাজী ফুলাদ খাঁ গোলমাল শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন। ফকিরবেশী আনন্দরামের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার ভক্তি হইল। তিনি বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে দুধ বিতরণ শেষ করিয়া আনন্দরাম যখন প্রকৃত ফকির লুৎফ উল্লার গৃহে পৌঁছিল, তখন দিল্লীর দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান তাহাকে প্রকৃত বাদশাহ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

প্রকৃত লুৎফ উল্লা তখন ঝিমাইতেছিল। তাহার রাবড়ী ফুরাইয়া গিয়াছিল। সে পূর্ব্বদিনের ভাঁড়টি শেষ করিয়া চাঁচিয়া অবশেষে টুকরাগুলি চিবাইয়া খাইয়াছিল। আনন্দরাম উঠানে গরুগুলি বাঁধাইয়া একটি ভাঁড় লইয়া যখন ফকিরের ঘরে ঢুকিল, তখন ম্লান প্রদীপের আলোকে আফিমচীর শুষ্ক

শীর্ণ মুখ সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "রাবড়ী এনেছ, বাঙ্গালী রাজা?"

আনন্দরাম হাসিয়া উত্তর দিল, "বহুৎ, তোমার দুই দিনের খোরাক।"

দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করিয়া ফকির রাবড়ীর পাত্রটা কাড়িয়া লইয়া তাহাতে একটু চুমুক দিয়া বসিয়া পড়িল। আনন্দরাম বলিল, "শাহ্ সাহেব, মনে রেখ, খোদা তোমাকে মহম্মদ শাহের বদলে দুনিয়ার বাদশাহী আর রাবড়ীর বাগিচা দিয়েছেন।"

লুৎফ উল্লা চিমটায় করিয়া কলিকায় আগুন দিতে দিতে বলিল, "রাবড়ীর বাগিচা! তোফা বহুৎ খুব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহম্মদ শাহের প্রত্যাবর্ত্তন

হিন্দুস্থানের বাদশাহ মহম্মদ শাহ ইরাণের বাদশাহ নাদির শাহের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন নৌবৎ বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, মহা ধূমধাম করিয়া। আর ফিরিলেন বেত্রাহত কুকুরের মত, লাঙ্গুল গুটাইয়া এবং ইরাণের দাসত্বের শৃঙ্খল গলায় পরিয়া। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দিল্লার হিন্দু-মুসলমান স্তম্ভিত হইয়া গেল। দুই চারিজন মুসলমান তখনও আশা করিয়াছিল যে, ইরাণের বাদশাহ মুসলমান। তিনি মুসলমানের উপর অত্যাচার করিবেন না। কিন্তু যাহারা নাদির শাহের সহিত লড়াই করিতে গিয়াছিল, তাহারা বুঝিয়াছিল যে, সকল মুসলমান এক রকম নহে। নাদিরের সেনাদলে অনেক দেশের মুসলমান ছিল—পাঠান, মোগল, তুর্কমান, তাতার বা চীন এবং কিজিলবাশ।

নাদির শাহের দিল্লী আগমনের পরের দিনই দিল্লীর সর্ব্বনাশের সুত্রপাত হইল। ইরাণীরা হিন্দুস্থানী মুসলমানদের জয় করিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং তাহারা দিল্লীর লোকের সঙ্গে বিজেতার মত ব্যবহার আরম্ভ করিল। দিল্লীর মুসলমানরা মনে করিয়াছিল যে, ইরাণের বাদশাহ যখন তাহাদের বাদশাহের অতিথি, তখন সমস্ত ইরাণী সৈন্যই তাহাদের অতিথি। অতিথি সংকারের ফলে ইরাণীরা যখন

ঘর হইতে সুন্দরী নারী এবং বহুমূল্য দ্রব্য বিনা অনুমতিতে সরাইতে আরম্ভ করিল, তখন শিয়া ও সুন্নী মুসলমানের চক্ষু ফুটিল। তাহারা বাধা দিতে আরম্ভ করিল ফলে রক্তপাত হইল।

নিরুপায় দিল্লীর নাগরিক, ফৌজদার লুৎফ উল্লা খাঁ সাদেকের কাছে গেল। তাহারা শুনিল যে নাদির শাহের অত্যাচারে লক্ষ্ণৌয়ের বিশ্বাসঘাতক সাদৎ খাঁ বিষপান করিয়াছে এবং ইরাণী সৈন্যের উপরে মোগল ফৌজদারের হুকুম চলিবে না। তখন হতাশ হইয়া ইতর ভদ্র সমস্ত মুসলমান ফকীর শাহ লুৎফ উল্লার নিকট ছুটিল।

আদৎ লুৎফ উল্লা খাঁ তখন মৌজে অচেতন। বুড়া কালে খাঁ দুয়ারে পাহারা দিতেছিল। সদানন্দ ও বনমালী সকালের দুগ্ধ দোহন করিয়া রাবড়ী তৈয়ারী করিতেছিল।

কালে খাঁ দুয়ার খুলিয়া দিল। যাহারা আদৎ লুৎফ উল্লাকে চিনিত, তাহারা অন্ধকার ঘরে ছিন্নশয্যার উপরে পতিত ফকির শাহ লুৎফ উল্লাকে দেখিয়া বুঝিল যে খোদা ফকির সাহেবকে দুনিয়ার মালিক করিলেও এখন তাঁহার বাদশাহী করিবার সামর্থ্য নাই। তাহারা ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেল।

আনন্দরাম তখন মুসলমান সাজিয়া দিল্লীর পল্লীতে পল্লীতে ফিরিতেছিল। নাদির শাহের হুকুমে বড় বড় আমীরদের ঘরে দশ বিশ জন করিয়া ইরাণী সৈন্য আশ্রয় পাইয়াছিল। তাহারা আমীরদের নিকট ভাল ব্যবহার

পাইয়া তাহাদের অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গলিতে বা নির্জ্জন স্থানে দুইচারি জন ইরাণী সৈনিক পাইলে দিল্লীর মুসলমানরা তাহাদের একেবারে খুন করিতেছিল। প্রথম প্রহর বেলায় আনন্দরাম কাবুল দরওয়াজার নিকটে একজন অল্পবয়স্ক ইরাণীকে গুণ্ডাদিগের হাত হইতে বাঁচাইল। সে ইরাণীর নাম ইব্রহিম। আনন্দরাম তাহাকে জানাইল যে, সে নিজে পাঠান এবং গ্রাম হইতে তরকারী আমদানী করিয়া দিল্লীর সমস্ত বাজারে সরবরাহ করিয়া থাকে। উপস্থিত তাহার ব্যবসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণ নাদির শাহ হিন্দুস্থানে আসিবার পরে জাঠ ও গুজরেরা প্রকাশ্যে দিনের বেলায় ডাকাতি করিতেছে। ইব্রাহিম বলিল যে, সে চাদনীচকে বাসা পাইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে একখানি সুন্দর মুখ দেখিয়া সে স্থির করিয়াছিল যে, হিন্দুস্থানী রূপের এই নমুনাটি সে দেশে লইয়া যাইবে। কিন্তু বিবির খসম তাহার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। আসিবার সময় সে ভুলিয়া দুই চারখানি রূপার বাসন সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। তাহা দেখিয়া দিল্লীর গুণ্ডারা তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। আনন্দরাম ইব্রাহিমের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে চাদনী চকের দিকে ফিরিল। তারপর তাহাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ করিতে বসিয়া গেল। সে বুঝিল যে, দিল্লীতে খাদ্যদ্রব্য একেবারেই পাওয়া যায় না। ফৌজদার লুৎফ উল্লা খাঁ সাদেক বহু কষ্টে নিত্য আটা যোগাইয়া থাকে।

মাংস সকল দিন জুটে না। তরকারীর একান্ত অভাব। বঞ্জারারা? সব দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। সহসা আনন্দরামের মস্তিষ্কে এক নূতন মতলব আসিল। সে বলিয়া বসিল যে, গাড়ী এবং ইরাণী সওয়ার পাইলে সে তাহাদিগকে তরকারী যোগাইতে পারে। ইরাণীরা তরকারী খাইবার আশায় নাচিয়া উঠিল। দিল্লী আসিয়া পর্য্যন্ত তাহারা তরকারী খায় নাই। তাহারা আনন্দরামকে তাহাদের কর্ত্তার কাছে লইয়া গেল। কর্ত্তা আনন্দরামকে সন্ধ্যার পর আসিতে বলিয়া স্বয়ং নাদির শাহের সেনাপতির নিকট গেলেন। আনন্দরাম হাসিতে হাসিতে বাসায় ফিরিল।

সেদিন দ্বিপ্রহরেও হিন্দুপল্লী শব্দহীন। লক্ষ্মী তাহার পিতামহী ও দিদির সহিত সমস্ত রাত্রি নীচের ঘরের জানালায় বসিয়াছিল। আনন্দরামের মুসলমানী বেশ সত্ত্বেও সে তাহাকে চিনিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চিৎকার শুনিয়া পাড়ার দুই চারিজন লোক পথে বাহির হইয়া পড়িল। আনন্দরাম তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

লক্ষ্মীর দিদি পদ্মিনী বিধবা। সে আনন্দরামের সম্মুখে বাহির হইত না। কিন্তু আজ আনন্দরাম তাহাকে অনাবৃত মস্তকে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। লক্ষ্মীর পিতামহী আনন্দরামের হাত ধরিয়া তাহাকে অন্দরে লইয়া গেলেন। পদ্মিনীও সেই অবস্থায় তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সমস্ত পরিচয় দিয়া

তবে আনন্দরাম সকলকে শান্ত করিতে পারিল। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সে দেখিল যে চিরপরিচিতার মত পদ্মিনী আজ তাহার সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা কহিতেছে। আজ আর আনন্দরামের লোকজন সে বাসায় ছিল না। সুতরাং পদ্মিনীই তাহার কাপড় আনিয়া দিল। ছাড়া কাপড় লইয়া গেল। স্নানের জল তুলিয়া দিল। বাঙ্গালী বাবুজী তেল মাখে। সুতরাং লক্ষ্মী একপাত্র ফুলেল তেল আনিয়া তাহার ছোট ছোট হাত দুটি দিয়া আনন্দরামের পায়ে তেল মাখাইতে বসিল। সুদূর প্রবাসে এই অপরিচিত ক্ষত্রিয় পরিবারের আন্তরিক প্রীতি দেখিয়া আনন্দরামের চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল। কিন্তু লক্ষ্মীর ব্যবহার দেখিয়া সে হাসিয়া ফেলিল এবং তাহাকে কোলে তুলিয়া বহু আদর করিল। অনাবৃত মস্তকে পদ্মিনী তখনও তাহার কাছে দাঁড়াইয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

চাচী

এতদিনে বাঙ্গলার নবাবের উকীল এনায়েৎ উল্লা খাঁর মনে সত্য সত্যই ভয় হইয়াছিল। শুজাউদ্দীন সত্য সত্যই মরিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্ত সরফরাজ খাঁ তখন বাঙ্গলার নবাব। পিতার দাসীপুত্র আক্রম জামান খাঁর উপরে তাঁহার ভীষণ আক্রোশ। একদিনে ঝড়ের মুখে ধূলার মত এত বড় মোগলের বাদশাহী উড়িয়া চলিয়া গেল। দিল্লীসহরে সুখ, শান্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। খাঁ সাহেবের মনে ভীষণ অশান্তি। ষোড়শী রূপসী বিবি কেবল জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া থাকে এবং গলির পারে সেই পাঠান যুবা ঠিক সেই সময়ে মুখ বাহির করে। এই বিপদের উপরে দলে দলে ইরাণী, কিজিলবাস, মোগল, তাতার, তুর্কমান ও পাঠান ঘরের ভিতর হইতে সুন্দরী যুবতী টানিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিবি কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ভয় পায় নাই। এনায়েৎ উল্লার মনে হয় যে, বিবি অন্দরে না থাকিয়া সর্ব্বদাই বাহিরে যাইতে প্রস্তুত। অন্য ভদ্র মুসলমানের কন্যা ও গৃহিণী পথে গোলমাল শুনিলে সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া যখন অন্দরে পলায়, তাঁহার বিবি তখন মাথার কাপড় ফেলিয়া বারান্দায় দাঁড়াইতে চায় অথবা তাঁহার নজর না পড়িলে জানালা হইতে মুখ বাহির করে।

এনায়েৎ উল্লার জীবনের সমস্ত সুখ একসঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। আফিম পাওয়া যায় না। তামাক ফুরাইয়া আসিয়াছে। মদ্য গোপনে পান করিলেও মৌজ সমান জমে না।

পাঠান ছোঁড়াটা কয়দিন ধরিয়া বেশী জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুন্সী বকাউল্লা কয়দিন ধরিয়া আর আসিতেছে না। দারোগা দয়ারাম মিত্র কর্নালের যুদ্ধের খবর শুনিয়াই বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছে। বাড়ীতে থাকিবার মধ্যে কেবল গয়ারাম। সে তামাক সাজে কিন্তু মুসলমানের হুঁকায় জল ফিরায় না। গুজরী ঝিটা আসা বন্ধ করিয়াছে। সুতরাং ষোড়শী রূপসী রাঁধিতেছেন। বাসন মাজিতেছেন। আর উকীল সরকার খাঁ সাহেব বাড়িতে ঝাড়ু মারিতেছেন ও হুঁকায় জল ফিরাইতেছেন। বিবির মেজাজ আগুন অপেক্ষা গরম। সুতরাং বাধ্য হইয়া খাঁ সাহেব বরফ অপেক্ষা ঠাণ্ডা। কিন্তু মনের ভিতরে, প্রাণে আগুন জ্বলিতেছে।

তখনও কিল্লার নকারাখানায় নৌবৎ বাজে। সুতরাং সে দিনও তৃতীয় প্রহরে নৌবৎ বাজিল। সঙ্গে সঙ্গে গলির মোড়ে একটা হল্লা উঠিল। তাহা শুনিয়া খাঁ সাহেবের বুক কাঁপিয়া উঠিল। হল্লাটা ক্রমশঃ নিকটে আসিল। গয়ারাম লাঠি গাছটা বাগাইয়া ধরিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু সে হল্লা বাঙ্গলার উকীলের দুয়ারের সম্মুখে আসিয়াই থামিল। দুয়ারটা ভাঙ্গিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দশ পনের জন গুণ্ডা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। গয়ারাম লাঠি গাছটা তুলিতেও পারিল না। খাঁ সাহেব বিবির ঘরে গিয়া দেখিলেন যে বিবি

নাই। তিনি তলোয়ার খুলিবার পূর্ব্বে গুণ্ডারা তাঁহারই পাগড়ী দিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া জিনিষপত্র লুঠিতে আরম্ভ করিল। লুঠপাট শেষ হইয়া গেলে তাহারা যখন মালপত্র লইয়া রাস্তায় বাহির হইল তখন বিবি অলঙ্কারের বাক্সটা লইয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। লাঠিয়াল গয়ারাম এবং বৃদ্ধ এনায়েৎ উল্লা বদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন।

ষোড়শী রূপসী চুড়িওয়ালা-গলির দিল্লাওয়ালী যখন কুলত্যাগ করিয়া নূতন খেলা আরম্ভ করিলেন, তখন হিন্দু ও মুসলমানের খোদা যে আর এক খেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন, বিবি তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

সব্জী মণ্ডী

শুক্রবারের দিন মহা সমারোহে ইরাণের বাদশাহ নাদির শাহ হিন্দুস্থানের বাদশাহের সিংহাসন অধিকার করিলেন। পরদিন শনিবারে ঈদের নামাজ। সেই দিন ফতেপুরী মসজেদ ও জুম্মা মসজেদ হইতে নূতন বাদশাহের নামে খেতাব পড়া হইবে। দেওয়ান-ই-আমে দরবার হইবে। সন্ধ্যাবেলা মজলীস বসিবে কিন্তু প্রধান অভাব—তরকারির। শুক্রবারের দিন সমস্ত বাজার খুঁজিয়া সহরের কোতোয়াল দুই সেরের অধিক শুষ্ক পিঁয়াজ খুঁজিয়া পাইলেন না। সব্জী মণ্ডীতে এক মুষ্টি শাকও মিলিল না। অন্য তরকারি অনেক দিন হইতেই দিল্লীতে দেখা যায় নাই। বিপন্ন হইয়া লুৎফ উল্লা খাঁ অনেক লোক বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, কিজিলবাস সওয়াররা দশ ক্রোশের মধ্যে মনুষ্যের বাস রাখে নাই। সুতরাং তরকারিত দূরের কথা একমুষ্টি তৃণও মিলিল না। তখন ইরাণী ইব্রাহিম নকল ফকির লুৎফ উল্লাকে তরকারীর আড়ৎদারের বেশে তহমাস্ক খাঁর কাছে লইয়া গেল। সে দুই আসরফী বখ্‌শিস পাইল। দ্বিপ্রহরে কুড়িখানা মহিষের গাড়ী ও একশত সওয়ার সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মীদের পাড়ার একজন বণিয়া তরকারী আনিতে মথুরার রাস্তায় চলিয়া গেল। ইব্রাহিম বুঝিল যে, তাহার বন্ধু আড়ৎদারই তরকারী আনিতে গেল। কিন্তু আনন্দরাম

তখন ফকির সাজিয়া দুগ্ধ বিতরণ করিতে বাহির হইয়াছিল। আর তাহার প্রতিবেশী বণিয়াকে তাহার নিজের পোষাকটা পরাইয়া দিয়াছিল।

শনিবারের দিন ঈদের নমাজ। নমাজ শেষ হইয়া গেলে দলে দলে সহর ও নগরবাসী মুসলমান যখন মসজেদ হইতে ফিরিতেছিল, সেই সময় কুড়িখানি গাড়ী বোঝাই তাজা শাক ও তরকারি জুম্মা মসজেদের সম্মুখ দিয়া চাদনীচক ও ফতেপুরী বাজারে আসিতেছিল। তরকারী দেখিয়া আনন্দে সহরের লোক কোলাহল আরম্ভ করিল। সওয়াররা বহু কষ্টে লুঠ বাঁচাইয়া মাল বাজারে পৌছাইয়া দিল। দরবারের প্রয়োজন বাদে দিল্লীর লোক যাহা খরিদ করিতে পারিল তাহা অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইল। সে দিন দিল্লীর বাজারে বেগুন ও শাক দুই টাকা সের দরে বিক্রয় হইয়াছিল। তহমাস্ক আড়তদারকে বখশিস্ ও খেলাত দিলেন। যে বণিয়া আনন্দরামের পোষাক পরিয়া গিয়াছিল, সে একদিনের ব্যাপারেই লাল হইয়া গেল। দরশরের হুকুম হইল যে, সে দিন সন্ধ্যাবেলা দুই দল সওয়ার পঞ্চাশখানি করিয়া গাড়ী লইয়া দুই পথে যাইবে। একদল যাইবে মথুরার পথে এবং অন্যদল মচেরীর পথে। আনন্দরাম তাহার বণিয়া বন্ধুকে ওখলার সরাইটা ভাড়া লইতে বলিয়াছিল এবং বহুকষ্টে তাহাকে রাজী করাইয়া মচেরীর দিকে পাঠাইয়া দিল।

সেই দিন রাত্রিতে আগুন জ্বলিল। দিল্লীর মুসলমানরা অতি গোপনে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে ভাঙ ও মদ পান

করিয়াছিল। ইরাণী সৈন্যের মোগল, তাতার ও কিজিলবাসরা এই সকল নিষিদ্ধ পানীয় প্রকাশ্যেই গ্রহণ করিয়াছিল। সন্ধ্যার পরেই তাহারা হিন্দুস্থানী-সৌন্দর্য্যের নমুনা স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সুতরাং ইরাণী সৈন্যদের সহিত দিল্লীর মুসলমানদের সংঘর্ষ বাধিল। এক ভাঙ-বিলাসী প্রচার করিয়া দিল যে, বাদশাহ মহম্মদ শাহের হুকুমে এক কামার প্রহরিণী নাদির শাহকে গুলী করিয়া মারিয়াছে। এই সংবাদ তুবড়ীর আগুনের মত দিল্লীর বাজারে বাজারে ছাড়াইয়া পড়িল। যাদের কবিলা বা মাশুক ইরাণীর হস্তগত হইয়াছিল তাহারা হাতিয়ার লইয়া সহরের পথে বাহির হইয়া পড়িল। দলে দলে মোগল, তাতার ও কিজিলবাশ দিল্লীর পথে নিহত হইল। নিশীথ রাত্রিতে আনন্দরাম পঞ্চাশখানি গাড়ী ও দুইশত সওয়ার লইয়া মথুরার পথে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি তিনটার সময় দিল্লীর মুসলমানদের মগজ শীতল হইল। তাহাদের নেশা ছুটিয়া গেল। সুতরাং ভবিষ্যতের ভাবনা এইবার তাহাদের অধীর করিয়া তুলিল।

রবিবার প্রভাতে হোলী। শেষ রাত্রিতে হিন্দুরা দলে দলে হোলীর গান গাহিতে গাহিতে পথে বাহির হইল। যে সকল ইরাণী পলাইয়া বাঁচিয়াছিল, তাহারা তাহাদিগের হাতে ধরা পড়িয়া মরিল। প্রভাতে নাদির শাহের নিকটে তাঁহার ইরাণী সৈন্যদের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিল। তিনি প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া কোতোয়ালীর সম্মুখে রওশন-উদ্দৌলার পুরাতন

মসজেদে আসিয়া বসিলেন। তখন আরম্ভ হইল দিল্লীর নাগরিক-সংহার। চাঁদনী-চৌক, দরিয়া বাজর, ফতেপুরী বাজার এবং জুম্মা মসজেদ মহল্লা রক্তের স্রোতে ভাসিয়া গেল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নৃশংস জিঘাংসামত্ত ইরাণী সৈনিকের হস্তে নিহত হইল। বিশাল দিল্লী নগরীর অন্যান্য মহল্লায় হিন্দুরা স্ত্রী-কন্যাকে বধ করিয়া হাতিয়ার লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। সম্ভ্রান্ত মুসলমান রমণীরা কুয়ায় পড়িয়া আত্মহত্যা করিল। অবশিষ্ট লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠিল।

যে দিন হইতে দিল্লীর লোক শুনিয়াছিল যে নাদির শাহ ভারতবর্ষে পদার্পন করিয়াছেন, তাহার পর দিন হইতে বণিয়ারা জিনিষ পত্রের দর চড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান আড়ৎদাররা মাল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিল। ক্রমে নাদির শাহ আসিয়া পৌছিলে, খাদ্য দ্রব্য দিল্লী সহরে এমন দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িল যে, ফৌজদার লুৎফ উল্লা খাঁ সাদেক নাদির শাহের ফৌজের রসদ সরবরাহ করা অসম্ভব বুঝিলেন। স্বয়ং কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ জোর করিয়া, মিনতি করিয়া এবং খোসামোদ করিয়াও বণিয়ার বজ্রের মত কঠোর হৃদয় নরম করিতে পারিলেন না। ফৌজদার লুৎফ উল্লা খাঁ এবং কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ বাধ্য হইয়া নাদির শাহের কর্ম্মচারী তহমাস্প খাঁর শরণাগত হইলেন

নূতন দিল্লী সহরের বাহিরে আজমীর ফটক দিয়া দিল্লী তর্কাবাদ বা কুতুবমিনারের দিকে যাইবার যে রাস্তা আছে,

তাহার দক্ষিণদিকে বহু হিন্দু বাণিয়ার বাস এবং আড়ৎ ছিল এবং এখনও আছে। তহমাষ্প খাঁর হুকুমে ইরাণী ঘোড়সওয়ার নসকচী (পুলিশ) পাহাড়গঞ্জের সমস্ত গোলা ঘিরিয়া ফেলিল। ইহার পূর্ব্বে হিন্দু সহরের ভিতর সমস্ত গোলাও আটক করা হইযাছিল এবং বণিয়ারাও হুকুম মত বাঁধা দরে জিনিষপত্র বেচিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পাহাড়গঞ্জের গোলা আটক হইবামাত্র চারি দিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া ইরাণীদের ঘিরিয়া ফেলিল। বণিয়ারা মনে করিয়াছিল যে কেবল হিন্দুরাই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে আসিবে। কিন্তু তাহারা বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, হাজার হাজার মুসলমান এক ফকিরের সঙ্গে আসিয়া হিন্দুদের দলে মিশিল। ফকির সবুজ পোষাক পরা। সে কেবল থাকিয়া থাকিয়া লাফাইয়া উঠে এবং বলে, "আল্লাহ করিম, খোদা আমাকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ করেছেন। কার হুকুমে আমার রাজ্যে লুঠ হয়!" তাহার সঙ্গে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানও ছিলেন। সৈয়দ নিয়াজ খাঁর অধীনে তাহারা এক মুহূর্ত্তে ইরাণী নসকচাদের দূর করিয়া দিল। ইরাণীরা দেখিতে দেখিতে টুকরা টুকরা হইয়া গেল। তাহাদের সঙ্গে যে কয়জন ফৌজদারের লোক আসিয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ রণে ভঙ্গ দিয়া কেহ দিল্লী, কেহ বা পাঁচকূয়ার দিকে পলাইল।

হিন্দু বণিয়াদের গোলা বাঁচাইয়া লোক ক্রমশঃ সরিয়া পড়িল। কিন্তু মুসলমানরা দল বাঁধিয়া আজমীর ফটক দিয়া সহরে ঢুকিল। যে মুহূর্ত্তে ষোড়শী দিল্লীওয়ালী চাচী তাহার

নূতন প্রাণেশ্বরের সহিত কুলত্যাগ করিতেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা গলির মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। চাচী হাঙ্গামা দেখিয়া একটু অস্ফুট চিৎকার করিয়া উঠিল। নূতন দলের একজন হুকুম দিল। তৎক্ষণাৎ চাচীর প্রাণেশ্বরের গুণ্ডারা চিৎকার করিয়া ধরাশায়ী হইল। একজন ফকির চাচাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তাহার বাড়ী কোথায়। পতিব্রতা চাচী এনায়েৎ উল্লা খাঁর বাড়ীর উল্টা দিক দেখাইয়া দিল। হিন্দু বা মুসলমান কাহারও কথার উত্তর না দিয়া চাচী তাহাদের সঙ্গে চলিল। তিন জন মুসলমান ও একজন হিন্দু তাহাদের নেতা। ক্রমে লোকের সংখ্যা কমিয়া আসিতে লাগিল। নেতারা মতিবাজারের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া যমুনাতীরে দরিয়াগঞ্জ মহল্লায় উপস্থিত হইল। তখন তাহাদের সঙ্গের লোক কমিয়া দশ পনের জনে দাঁড়াইয়াছে। নেতাদের মধ্যে একজন চাচাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু চাচী নড়িল না। কোন কথাও কহিল না। নেতারা বিপদে পড়িল। যমুনাতীরে খয়রাতী ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়াও কোন ফল হইল না। তখন দুই জন মুসলমান ও হিন্দুটি চলিয়া গেল। কেবল ফকির রহিল। চাচী নড়িল না। তাহা দেখিয়া ফকির ওরফে আনন্দরাম অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই দিন পথে বিবর্জিতা নারীকে আশ্রয় দিয়া আনন্দরাম প্রথম চালে ভুল করিল। সে ধীরে ধীরে চাচীকে সঙ্গে করিয়া সমস্ত দিল্লী সহরটা পার হইয়া আসিল। তারপর চাচীকে ফকির লুৎফ উল্লা শাহের ঘরে

লইয়া আসিল। পথে দলে দলে দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমান তাহাদের ঘিরিয়া চলিল। কিজিলবাশ, তাতার বা মোগলকে তাহাদের দিকে আসিতে দিল না।

দ্বিপ্রহরের পরে পঞ্চাশ গাড়ী বোঝাই বেগুন, মূলা ও শাক লইয়া বণিকবেশী আনন্দরাম যখন দিল্লী দরওয়াজার পথে দিল্লী সহরে প্রবেশ করিল তখন মহানগরী নীরব, নিস্তব্ধ। দলে দলে রক্তাক্ত ইরাণী সৈনিক উল্লাসে চিৎকার করিয়া পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। দলে দলে রূপসী নারী রজ্জুবদ্ধ হইয়া নাদির শাহের সেনা নিবাসে প্রেরিত হইতেছে। শতশত নরমুণ্ড চাঁদনী চৌক ও জুম্মা মসজেদের পথে গড়াইতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দরাম ধৈর্য্য হারাইল। বহুকষ্টে সংযত হইয়া মাল বাজারের দারোগার হস্তে সমর্পণ করিয়া সে বাসায় ফিরিল। এক রাত্রির মধ্যেই সে তাহার সঙ্গী দুই শত সওয়ারকে বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা তাহার সঙ্গে আসিয়া তাহাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিল এবং জন কতক আনন্দরামের অনুরোধে পথে দাঁড়াইয়া রহিল। আনন্দরাম বাসায় আসিয়া দেখিল যে, পদ্মিনীর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছে। কিন্তু লক্ষ্মী তখনও স্থির আছে।

তখন সে দ্বিতীয়বার চালে ভুল করিল। মহল্লার সমস্ত রমণী একত্র করিয়া প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া তাহাদিগকে ফকির লুৎফ উল্লার গৃহে লইয়া আসিল। দশজন ইরাণী সওয়ার পাহারায় রাখিয়া আনন্দরাম কোতোয়ালীতে ফিরিয়া গেল। নাদির শা তখনও রওশন উদ্দৌলার মসজেদে বসিয়া আছেন

এবং সংহারলীলা অবাধে চলিতেছে। আনন্দরাম সন্ধ্যায় পঞ্চাশখানি গাড়ী লইয়া তরকারি আনিতে যাইবার ছাড়পত্র বা দস্তক পাইয়া ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় প্রহর বেলায় নিজাম্-উল্-মুলক্ প্রভৃতি প্রধান আমীররা বাদশাহ মহম্মদ শাহের অনুরোধে নাদির শাহের নিকটে আসিয়া রক্তস্রোতপ্রবাহ স্থগিত করিতে অনুরোধ করিলেন। নাদির শাহের হুকুমে প্রকাশ্য নরহত্যা স্থগিত হইল বটে কিন্তু গোপনে লুণ্ঠন ও রক্তপাত অব্যাহত রহিল।

আদত লুৎফ উল্লার গৃহে ফিরিয়া আনন্দরাম যখন ফকির সাজিয়া আবার পথে বাহির হইল, তখন প্রত্যেক মহল্লার ইতর ভদ্র, ধনী ও নির্ধন তাহাকে বেষ্টন করিল। সকলকে আশ্বাস দিয়া আনন্দরাম তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিল। ফকিরের প্রতিপত্তি দেখিয়া ইরাণীরা বিস্মিত হইল। মহল্লায় সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। সকলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইল। যাহাদের অস্ত্র ছিল না বা যাহারা কিনিতে পাইল না, তাহারা ধার করিয়া লইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চাচীর প্রেম

যে দশ জন ইরাণী সৈনিককে লুৎফ উল্লার গৃহে পাহারা রাখিয়া আনন্দরাম বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন "অজাতশত্রু" কিজিলবাস যুবা ছিল। চাচী দুই দিন ও এক রাত্রি এই বাড়ীতে আবদ্ধ ছিল। সেই সময়ে সে লুৎফ উল্লার দ্বিতল-গৃহে তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াও প্রেমের আধার খুঁজিয়া পায় নাই। কালে খাঁ চাচার সমান বয়সী এবং বনমালী ও সদানন্দ তাহা অপেক্ষা দুইচারি বছরের ছোট। সুতরাং বৃদ্ধা ভার্য্যা তরুণীর উচ্ছলিত প্রেম প্রবাহ ক্ষণেকের জন্য আবদ্ধ হইয়াছিল। কিজিলবাস যুবাকে দেখিয়া সে প্রবাহ সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাহার দিকে ছুটিল। চাচী ফারসী বুঝিত না এবং কিজিলবাস বাঙ্গলা বা হিন্দুস্থানী জানিত না। কিন্তু তাহাতে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইল না। প্রেমের নীরব ভাষা উভয়ের মনের দুয়ার খুলিয়া দিল। নিমেষের মধ্যে তরল প্রেম ঘনীভূত হইল। আনন্দরাম তখন মহল্লার পল্লীরক্ষার ব্যবস্থায় ফিরিতেছিলেন। সমস্ত দিনের অনশনক্লিষ্ট মাহিলারা যখন সন্ধ্যার পরে রন্ধনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন চাচীর প্রেম-প্রবাহ সহসা বাধা পাইয়া প্রলয়ের সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিল। ইরাণী দূর হইতে অগ্নির আলোকে অবগুণ্ঠনমুক্তা পদ্মিনীকে দেখিয়া ফেলিল। সহসা

চাচীর প্রতি তাহার প্রেম শীতল হইয়া গেল। সে বুঝিল যে, হিন্দুস্থানী রূপের নমুনা যদি তাহার সুদূর হিমানী-মণ্ডিত ইরাণে লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে সে এই চাচী নয়। যৌবনের প্রেম তরল। প্রথম যৌবন অতীত না হইলে প্রেম স্থির ঘনত্ব পায় না। নয়নের তৃষ্ণা না মিটিলে মানুষ চিনিতে শিখে না। সুতরাং যুবা কিজিলবাস চাচীর অতৃপ্ত আকাঙ্খার আকুল আহ্বান এক নিমেষের মধ্যে ভুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রেমের নীরব ভাষায় চাচীকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার বঁধুয়া তাহারই আঙ্গিনা দিয়া আন বাড়ী চলিয়াছে। তীব্র ক্ষুধা সেই মুহূর্ত্তে তীব্র জিঘাংসায় পরিণত হইল। কিন্তু তাহার তলে আকাঙ্খা তখনও রহিয়া গেল।

আনন্দরাম ফিরিয়া আসিল। তাহার সঙ্গে পঞ্চাশখানি মহিষের গাড়ী সেই সঙ্কীর্ন গলির ভিতরে সারি দিয়া দাঁড়াইল। তরকারীর ঝুড়ির ভিতরে একজন দুই জন করিয়া নারী বসাইয়া আনন্দরাম যখন গাড়ী লইয়া মথুরার পথে যাত্রা করিল, তখন চাচী আসিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। সে কিছুতেই এখানে থাকিবে না। সেই নির্জ্জন পুরীর ভিতরে তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছে। তাহার উপরে সদানন্দ এবং বনমালী তাহার প্রতি সতৃষ্ণ কটাক্ষপাত করিয়া তাহাকে ধর্ম্মনাশের ভয়ে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। আনন্দরাম চাচীকে অনেক বুঝাইল বটে, কিন্তু বুঝিবে কে? চাচী শুনিয়াছিল যে, তরুণ কিজিলবাস সে রাত্রিতেও আনন্দরামের সঙ্গে চলিয়াছে। তাহার উপরে সে নিজের চোখে

দেখিয়াছে যে, গাড়ীতে পদ্মিনী ও লক্ষ্মী উঠিয়াছে। আর কিজিলবাস সেই গাড়ীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে সকল বাধা কাটাইয়া স্থানাভাব না মানিয়া পদ্মিনীর ঝুড়িতে গিয়া বসিল। তখন একে একে গাড়ীর সারি চলিতে লাগিল। তহমাস্ক খাঁর ছাড়পত্র দেখিয়া *দিল্লী দরওয়াজায় পাহারা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল।

দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত গাড়ী ওখ্‌লার প্রকাণ্ড সরাইয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সরাইতে রমণীদিগকে রাখিয়া আনন্দরাম তাহাদের সব বন্দোবস্ত করিতে একঘণ্টা কাটাইয়া দিল। তাহার জন্য তরকারি প্রস্তুত ছিল। সুতরাং গাড়ীতে মাল বোঝাই করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। দ্বিতীয় প্রহর বেলায় সে সারি সারি গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কিন্তু দিল্লী পৌঁছিতে তাহার সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন হইতে দুই একজন করিয়া সওয়ার কম পড়িতে লাগিল। দিল্লী দরওয়াজায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে সর্দ্দার বলিল যে, সাত জন সওয়ারকে পাওয়া যাইতেছে না। তখন দিল্লীর ভীষণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। দিল্লীর চারিদিকের গুর্জ্জর ও জাঠ জাতীয় হিন্দুরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। জাঠ বদনসিংহের সৈন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং মুসলমানদিগকে অসতর্ক পাইলেই তাহাদিগকে একেবারে নির্ম্মূল করিতেছে। এই অবস্থায় সাত জন সওয়ার হারাইয়া সর্দ্দার অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পরেই সে সমস্ত তরকারী বাজারে পৌঁছাইয়া

দিল। তারপর আনন্দরাম বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লক্ষ্মীদের বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। কেবল কালে খাঁ অদ্য লুৎফ উল্লার পাহারায় রহিল।

সাত জনের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিল সেই কিজিলবাস। অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিলে সে ধীরে ধীরে পিছাইয়া পড়িয়াছিল। তারপর আনন্দরামের দল অগ্রসর হইবামাত্র সে ঘোড়া ফিরাইয়া একেবারে ওখ্‌লার দিকে ছুটিল। তাহার পরে আরও যে ছয় জন দল ছাড়িয়াছিল তাহারাও রমণীরত্নের সন্ধানে ছিল। কিন্তু অন্ধকারে পথ হারাইয়া সকলে ওখ্‌লায় পৌঁছিতে পারে নাই। বদনসিংহের জাঠরা তাহাদিগের মধ্যে চারিজনকে পাইয়া কণ্ঠে রজ্জু দিয়া তাহাদিগকে একটা বৃহদাকার বাবুল বৃক্ষে ঝুলাইয়া দিয়াছিল। তিন জন একসঙ্গে মিলিয়া যখন ওখলায় পৌঁছিল, তখন রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। পল্লীর আলো নিবিয়া গিয়াছে। অন্য সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেও চাচী তখনও বিনিদ্র ছিল। তাহার প্রখর ক্ষুধা এবং প্রবলতর জিঘাংসা তাহাকে নেত্র মুদিতে দেয় নাই। প্রেমের নীরব ভাষা চাচীকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, তাহার প্রেমের আধার কিজিলবাস নিশ্চয়ই ফিরিবে। সুতরাং চাচী ওখলার রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত সরাইয়ের দ্বিতল কক্ষের গবাক্ষে বসিয়াছিল। অন্ধকারে অশ্বপদ-শব্দ শুনিতে পাইয়া চাচী অতি সন্তর্পণে নীচে আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল এবং অন্ধকারে লুকাইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে সেই খোলা দুয়ার দিয়া চোরের মত

ধীরে ধীরে তিন জন কিজিলবাস সরাইয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। চাচী তখন বাহির হইয়া তিনটি ঘোড়ার একটিতে উঠিয়া বসিল। তিনজন কিজিলবাস তিনটি রমণীকে লইয়া আসিয়া যখন অশ্বে আরোহণ করিতে যাইবে, তখন একটি ঘোড়া পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে রমণীত্রয়ের আর্ত্তনাদে সরাইয়ের লোক জাগিয়া উঠিল। চাচীর প্রেমপাত্র ও তাহার একজন সঙ্গী ঘোড়া লইয়া পলায়ন করিল। তৃতীয় কিজিল-বাসের মুণ্ড গুজর গ্রামবাসীরা সরাইয়ের দরওয়াজায় টাঙাইয়া দিল। অন্ধকারে চাচীর কিজিলবাস বুঝিতে পারিল না যে, সে পদ্মিনীকে পায় নাই। চাচী তাহাদের সঙ্গে নিরাপদে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিল। তখন দিল্লীতে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দলবদ্ধ নাগরিক জীবন পণ করিয়া ইজ্জত রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু নাদির শাহ তখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাদশাহী মজলীস

নিশ্চিন্ত হইয়া আনন্দরাম যখন বাসায় পৌঁছিল, তখন তাহার প্রতিক্ষায় একজন অজ্ঞাত মুসলমান লক্ষ্মাদের বাড়ীর দুয়ারে বসিয়াছিল। আনন্দরাম তখনও আড়তদারের বেশ ধরিয়া ছিল। সুতরাং আগন্তুক তাহাকে চিনিতে পারিল কিনা, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। বাড়ীর ভিতরে গিয়া আনন্দরাম শুনিল যে, সে লোকটি নূর বাঈয়ের নিকট হইতে আসিয়াছে। পোষাক ছাড়িয়া সে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আগন্তুক আসিয়া তাহার হাতে দুইখানি পত্র দিল—একখানি ফার্সী পত্রে নূর বাঈ লিখিতেছেন যে, আজ রাত্রিতে দরবারে মজলীস। দিল্লীর আর সমস্ত নর্ত্তকীর সহিত তাহারও দরবারে যাইবার হুকুম আসিয়াছে। যদি সে বিপদে পড়ে, তাহা হইলে বাঙ্গালী বাবুজী যেন তাহাকে রক্ষা করে।

বাঙ্গলা পত্রখানি গোলাপী লিখিয়াছে। তাহাতে চারিটি কথা ছিল। তাহা পড়িয়া আনন্দরাম কাঁদিয়া ফেলিল। সাহেব জাদা আক্রম জমান খাঁ তখনও মদ্যপানে অচেতন। নূর বাঈয়ের দাস দাসী সমস্তই পলাইয়াছে। চারিদিকে মোগল, তাতার, কিজিলবাস ও তুর্কমান ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উপায় কেবল আনন্দরাম।

আগন্তুককে বিদায় করিয়া দিয়া আনন্দরাম দরবারী সাজিল। সেদিন মজলীসে তাহার নিমন্ত্রণ হয় নাই বটে, কিন্তু ইরাণীদের নসকচী বা পল্টনের পুলিশ ও মোগল বাদশাহী দরবারের

পাহারা এড়াইবার উপায় সে অনেকদিন হইতেই করিয়া রাখিয়াছিল। দরকারী পোষাক পরিয়া আনন্দরাম যখন রাস্তায় বাহির হইল, তখন আর তাহাকে হিন্দু বলিয়া চেনা যায় না। পথে দুই একজন কিজিলবাস ও তাতার তাহাকে ধরিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে লোকবল ছিল বলিয়া তাহারা তাহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে ভরসা করে নাই।

সে যখন প্রাসাদের লাহোরী ফটকে আসিয়া পৌঁছিল, তখন প্রথম ফটক হইতে নকারাখানা পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য। অপর লোক হইলে সে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে যাইতে পারিত না। আনন্দরাম ও বনমালী দুই দণ্ড ধরিয়া ভিড় ঠেলিয়া নকারাখানায় পৌঁছিল। সেখানে উজীর কামরুদ্দীন খাঁর পুত্র মীর মন্নু তাহাকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। দেওয়ান-ই-আমের সম্মুখে বিস্তৃতচক্রে শতাধিক নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে। দরবার গৃহের ভিতরে বিখ্যাত ময়ুর-সিংহাসনে নাদির শাহ ও মহম্মদ শাহ উপবিষ্ট। হিন্দুস্থানের বহু সম্ভ্রান্ত আমীর সেই দরবারে উপস্থিত আছেন। আনন্দরাম দূর হইতে দেখিল যে উজীরের প্রধান কর্ম্মচারী মজলীস রায় ও বাঙ্গলার উকীল-সরকার এনায়েৎ উল্লা ওরফে চাচা দরবার গৃহ ও চক্রের একপার্শ্বে উপবিষ্ট। আনন্দরাম ধীরে ধীরে আশ ও শোটা পরিবেষ্টিত দরবারের শ্রেণীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই সময়ে হঠাৎ নর্ত্তকীরা নাচিতে নাচিতে ফিরিয়া গেল। তাহাদের সম্মুখে নূর বাঈও নাচিতেছিল। সে আনন্দরামকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার নাচের তাল কাটিয়া গেল। পাশের নর্ত্তকীরা বিভ্রাটে পড়িল এবং

প্রধান তবলচী বিষম খাইল। নিকটের লোক ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ধূর্ত্ত লোক ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে চাহিতে আরম্ভ করিল। যে নূর বাঈয়ের জন্য স্বয়ং বাদশাহ মহম্মদ শাহ এবং কমরুদ্দীন খাঁ এত দিন ধরিয়া বিষম খাইয়া আসিতেছেন, সে হঠাৎ কাহাকে দেখিয়া নাচের মুখে চমকাইল? এত বড় লোকটা কে?

ততক্ষণ নূর বাঈকে ইঙ্গিত করিয়া আনন্দরাম দূরে সরিয়া গিয়াছিল। সে মজলীস রায় ও চাচার সম্মুখে পৌছিয়া তাদের সঙ্গে আলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই সে ইঙ্গিত করিয়া বনমালীকে নিকটে ডাকিল। দূর হইতে নূর বাঈকে তাহার অনুচরকে দেখাইয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। সে যখন লাহোরী ফটকের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দরওয়াজার উপরে বাদশাহী নৌবৎ দ্বিতীয় প্রহরের বাদ্য আরম্ভ করিয়া দিল। আনন্দরাম ঘোড়ায় চড়িয়া তীব্রবেগে নূর বাঈয়ের কাঠরার দিকে ছুটিল।

প্রাসাদে যখন এত সমারোহ, তখন দিল্লীর প্রধান রাজপথ অন্ধকারময় ও জনশূন্য। দিল্লীর গুণ্ডারা তাহার পূর্ব্বেই কিজিলবাস ও তাতারের হস্তে প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। দোকানপাট যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা ইরাণীরা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে। পথে দলে দলে ইরাণী-সৈন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইরাণের বাদশাহ নাদির শাহের দিল্লী-প্রবেশের চারদিন পরে মোগল সম্রাটের রাজধানীর এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

নূর বাঈয়ের কাঠরার সম্মুখে পৌছিয়া আনন্দরাম দেখিল

যে, সে মহল্লা জনশূন্য। কাঠরার সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত এবং গৃহে মানুষ আছে বলিয়া বোধ হয় না। সঙ্গীদিগকে দূরে রাখিয়া আনন্দরাম কাঠরার দুয়ারে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মীপেঁচার মত ডাকিতে আরম্ভ করিল। ডাক শুনিয়া পথে দুই চারি দল ইরাণী-সৈন্য থমকিয়া দাঁড়াইল কিন্তু অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তাহারা যথাস্থানে চলিয়া গেল। দশ বারো বার ডাক দিবার পর দুয়ারের পিছন হইতে বাঙ্গলায় বামাকণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

আনন্দরাম অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল, "গোলাপী দিদি, আমি আনন্দরাম।"

দুয়ার খুলিয়া গেল। আনন্দরাম কাঠরার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

সেই রাত্রিতে নূর বাঈয়ের কাঠরায় মদ্যপানে অচেতন আক্রম জমান এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যা গোলাপী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। আনন্দরাম গোলাপীর সঙ্গে উপরে চলিয়া গেল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া স্থির করিয়া আসিল যে, পরদিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে এবং তাহার প্রেমপাত্র আক্রম জমানকে তরকারির ঝুড়িতে বসিয়া ওখলা যাত্রা করিতে হইবে। তৃতীয় প্রহর শেষ হইলে আনন্দরাম যখন বাহিরে আসিয়া নিজের দলে মিশিল তখন সে দেখিল যে বনমালী আসিয়া সেখানে তাহার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিল যে, মজলীস শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু নূর বাঈ আটক পড়িয়াছে। নাদির শাহ হুকুম দিয়াছেন যে, তাহাকে প্রাসাদেই থাকিতে হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নূতন নূর বাঈ

রাত্রির তৃতীয় প্রহর শেষ হইবার অল্প পরেই নূর বাঈয়ের একজন ভৃত্য ব্যস্ত হইয়া দিল্লীর দরওয়াজার পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিল। তখন মজলীস শেষ হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সকলে প্রাসাদের বাহিরে আসেন নাই। দিল্লীর প্রাসাদের উভয় ফটকে তখনও অসংখ্য পাল্কী ও তঞ্জাম অপেক্ষা করিতেছিল। ফুলাদ খাঁর দস্তক ও হুকুমনামা দেখিয়া প্রহরীরা ভৃত্যকে পথ ছাড়িয়া দিল। পথে মুবারক-মঞ্জীলের সম্মুখে একজন খোজা তাহাকে বলিয়া দিল যে, নর্ত্তকীরা লাহোর ফটকের সম্মুখে যায়গা পাইয়াছে।

সে সময়ে ভীমমূর্ত্তি লাহোর ফটকের সম্মুখে ভীষণ-দর্শন নকারাখানার পার্শ্বে অনেকগুলি রক্তপ্রস্তরের প্রাসাদ ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পরে সেগুলি ভাঙ্গিয়া ইংরেজের সেনানিবাস তৈয়ারী হইয়াছিল।

মজলীস ভাঙ্গিবার পরে বাদশাহের বাদশাহ নাদির শাহের হুকুম শুনিয়া হতভাগিনী নূর বাঈ একটি প্রাসাদের ছাদে দাঁড়াইয়া ছিল। সে তখনও মুজরার পোষাক ছাড়ে নাই। শত শত আমীর ওমরাহের প্রদত্ত বহুমূল্য রত্নালঙ্কার তখনও তাহার অঙ্গে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ঝকঝক করিতেছিল। দূর হইতে তাহা দেখিয়া তাহার ভৃত্য সেই দিকে চলিল। সে প্রাসাদের

নীচে দাঁড়াইয়া নূর বাঈয়ের পরিচারিকাকে নাম ধরিয়া ডাকিল। পরিচারিকা নামিয়া আসিলে ভৃত্য তাহাকে বলিল যে, সে বাড়ী হইতে আসিয়াছে। বিশেষ জরুরী খবর আছে।

পরিচারিকা তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না। তখন সেই ভৃত্য তাহাকে হিন্দীতে বলিল, "নূর বাঈকে গিয়ে বল, আমি বাঙ্গালী রাজা, চাকর সেজে এসেছি।"

পরিচারিকা প্রথমে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু নীচের তলার অন্ধকারে ইরাণী প্রহরী তাহা দেখিতে পাইল না।

ছাদের উপর গিয়া পরিচারিকা যখন নূর বাঈকে বলিল, যে বাড়ী হইতে একজন চাকর আসিয়াছে তখন নুর বাঈ হঠাৎ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল, "আমার সঙ্গে বে-আদবী হারামজাদী, চাবুক মেরে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেব!" নূর বাঈ তখন ভুলিয়া গিয়াছিল যে সে বন্দিনী। কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া বাঁদী তাহার নিকটে গিয়া কানে কানে বলিল, "বাঙ্গালা রাজা।"

তৎক্ষণাৎ নূর বাঈ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে যে আত্মত্রাণের জন্য নিজে আহ্বান করিয়া আনন্দরামকে সিংহের গহ্বরে আনিয়াছে, সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল। বাঁদী তাহার অবস্থা দেখিয়া নিম্নতল হইতে পরিচারক বেশী আনন্দরামকে ছাদে ডাকিয়া আনিল। তাহাকে দেখিয়া নূর বাঈ চিৎকার করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আনন্দরাম তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, "চুপ"। সঙ্গে সঙ্গে সে পরিষ্কার ফারসী ভাষায় নূর বাঈয়ের মুন্সী, হরকরা,

গোলাম ও বাঁদীগণের বাড়ী হইতে পলায়ন-বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল। ইরাণীপ্রহরী একতলার দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই আনন্দরাম মাঝে মাঝে দুই একটা বাঙ্গলা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। কারণ, সে জানিত যে, গোলাপী নূর বাঈকে দুই একটা বাঙ্গলা কথা শিখাইয়া ছিল।

ফারসীতে আক্রম জমান খাঁর আকণ্ঠ মদ্যপানে গোলাপীর দুর্দ্দশা, চাচীর পলায়নে বাঙ্গলার উকীল সরকার এনায়েৎ উল্লা খাঁর দুরবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ অনাবশ্যক কথা বলিতে বলিতে আনন্দরাম নূর বাঈকে পরিষ্কার বাঙ্গলায় বুঝাইয়া দিলে যে, তাহার পরিচারকের পোষাকের নীচে সে নূর বাঈয়ের মজলীসী মুজরার একটা পেশোয়াজ পরিয়া আছে। নূর বাঈকে নীচে গিয়া পরিচারকের পায়জামা, চাপকান, চোগা ও পাগড়ী পরিতে হইবে। অলঙ্কারগুলা আনন্দরাম পরিবে। তাহার পরে আনন্দরাম নূর বাঈ হইবে ও নূর বাঈকে পরিচারক সাজিয়া ফুলাদ খাঁর দস্তক দেখাইয়া লাহোর ফটক দিয়া বাহিরে যাইতে হইবে। ফটকের বাহিরে পাল্কী আছে। তাহার পরে গোলাপী যাহা বলিবে, তাহাই করিতে হইবে। নূর বাঈ সব কথা শুনিয়া গেল। কিছু বলিল না।

বাঁদী যখন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে দ্বিতলের অন্ধকার কক্ষে আনিল, তখন নূর বাঈ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। সে কিছুতেই পলায়ন করিতে রাজী নহে। সে নিজের তুচ্ছ জীবনের জন্য বাঙ্গালী বাজার জীবন নষ্ট করিবে না। সূর্য্যোদয় হইলেই ইরাণী প্রহরী তাহার ছিন্ন মুণ্ড শাহান শাহের দরবারে

উপস্থিত করিবে। সে ভুল করিয়া ভয় পাইয়া বাঙ্গালী রাজাকে এখানে আনিয়াছিল।

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আনন্দরাম নূর বাঈয়ের কোন কথার জবাব দিল না। সে জোর করিয়া নূর বাঈয়ের অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইল। তারপর নিজের পুরুষের পোষাক খুলিয়া দিয়া বাঁদীকে সেই পোষাক নূর বাঈকে পরাইয়া দিতে বলিল। নূর বাঈ প্রথমে আপত্তি করিল। কিন্তু বাঁদী জোর করায় সে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বাহিরে ইরাণী প্রহরীর তন্দ্রা আসিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা, করিল, "নাচনেওয়ালীর কি হইয়াছে?"

বাঁদী গিয়া তাহাকে বুঝাইয়া আসিল যে আটক পড়িয়া বিবি সাহেবের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

এক দণ্ড পরে আনন্দরাম স্বয়ং পরিচারকবেশী নূর বাঈকে ঠেলিয়া দুয়ার হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহাকে পরিচারক মনে করিয়া ইরাণী প্রহরী বা দিল্লীর বাদশাহী প্রহরীরা কিছুই বলিল না। লাহোর ফটকের বাহিরে আনন্দরামের পাল্কী ছিল। সে তাহাতে চড়িয়া নিজের গৃহে চলিয়া গেল।

সে দিন তরকারি আনিতে আনন্দরামের অংশীদার বণিয়ার যাইবার কথা। বড় বড় বেগুনের বাজরার ভিতরে বসিয়া সাহেবজাদা আক্রম জমান খাঁ, গোলাপী ও নূর বাঈ দিল্লী সহর হইতে বাহির হইয়া গেল। গাড়ীগুলি যখন পুরাতন দিল্লীর সীমানায় পৌছিল, তখন একজন ইরাণী সওয়ার ঘোড়া ছুটাইয়া

ফটকের নিকটে আসিয়া সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই পথে কি তরকারি আনিতে মহিষের গাড়ী গিয়াছে ?"

সর্দ্দার বলিল, "তাহারা এতক্ষণ নিজাম উদ্যান পৌছিয়াছে।"

সওয়ার ঘোড়া ছুটাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে বদন সিংহের জাঠ সৈন্য পুরাতন দিল্লী লুঠিতে আসিয়াছিল। তাহারা ফিরোজ শাহের কোটলার নিকট সওয়ারকে একা পাইয়া তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল। তরকারির বাজরা মাল সমেত ওখলায় পৌছিয়া গেল।

নূর বাঈ লাহোর ফটক ছাড়াইয়া গেল কিনা, দেখিবার জন্য আনন্দরাম অল্পক্ষণ পরে বাঁদীকে পাঠাইয়া দিল। বাঁদী যখন সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল তখন কাক ডাকিতেছে ও জ্যোৎস্না ম্লান হইয়াছে।

নূর বাঈয়ের সমস্ত অলঙ্কার পরিয়া যখন আনন্দরাম বাঁদীর সঙ্গে ছাদের উপরে গিয়া দাঁড়াইল, তখন ইরাণী প্রহরী একবার চোখ মুছিয়া চারিদিকে চাহিল। তাহার মনে হইল যে, দিল্লীর নাচনেওয়ালী তখনও সেই ভাবে ছাদে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। আনন্দরাম তখন পেশোয়াজ, আঙ্গরাখা বা ওড়না ও অলঙ্কার দ্বিতলের একটি ঘরে সাজাইয়া রাখিয়া তাহার উপর বালিশ দিয়া একখানা চাদর চাপা দিল। নূর বাঈয়ের দুইজন বাঁদী ছিল প্রভুভক্ত। তাহারা মনিবের জন্য মরিতেও প্রস্তুত ছিল। তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া ঝুলির ভিতর হইতে কিজিলবাসের পোষাক বাহির করিয়া পরিয়া আনন্দরাম যখন বাহিরে চলিয়া গেল, তখন ইরাণী প্রহরী তাহাকে

চিনিতে পারিল না।

তখন পূর্ব্বদিকে আলো দেখা দিয়াছে। হিন্দুস্থানী ও ইরাণী সমস্ত প্রহরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেবল দুইজন দাঁড়াইয়া আছে। আনন্দরাম তাহাদিগের নিকটে গিয়া কাপড়ের মধ্য হইতে দুইটি চামড়ার বোতল বাহির করিল। তারপর তাহাদের বলিল যে, হিন্দুস্থানের বাদশাহ এই তাজা আরক তাহাদের উপহার দিয়াছেন। আনন্দরাম তাহাদের সঙ্গে এমন দ্রুতবেগে তাজা মাল টানিতে আরম্ভ করিল যে শীঘ্র ফুরাইয়া যাইবার ভয়ে তাহারাও পানের মাত্রা বাড়াইতে বাধ্য হইল। চারিদিক যখন পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে তখন তিন জনেই মাতাল।

চারিদিক নিস্তব্ধ। পথে লোকজন নাই। মজলীসে নিমন্ত্রিত আমীর ওমরাহ সকলে চলিয়া গিয়াছে। আনন্দরাম অবশিষ্ট আরক প্রহরীদের হাতে দিয়া দিল্লীর ফটক হইতে বাহির হইয়া পড়িল। কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

তখনও তাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন। সে ফকির লুৎফ উল্লার বাড়ীর গলির মোড়ে গিয়া দেখিল যে, ইরাণী ও তাহার সৈন্যে গলি ভরিয়া গিয়াছে। আফিমের নেশায় অচেতন লুৎফ উল্লাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া লোকেরা তাহার মাথায় জল ঢালিতেছে। আনন্দরাম দূর হইতে সরিয়া পড়িল। কিন্তু কালে খাঁর জন্য তাহার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাক্ষসী

যথা সময়ে প্রেমাস্পদের পশ্চাৎ চাচী ঘোড়ায় চড়িয়া 'ওখলা' হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিল। তারপর রাত্রিতে সে এক মসজেদে লুকাইয়া রহিল। প্রভাতে সে তাহার প্রেমাস্পদের বস্ত্র ধারণ করিল। কিজিলবাস যুবা যে হিন্দু রমণীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল, সে বেচারা কদাকার ও মধ্যবয়সী। সুতরাং সে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বিশেষ কুণ্ঠিত হইল না। অল্পক্ষণ পরে যখন দিল্লী সহরময় গোল উঠিল যে নর্ত্তকী নূর বাঈকে কে দিল্লীর বাদশাহের প্রাসাদ হইতে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে, তখন চাচী কিজিলবাসকে বুঝাইয়া দিল যে, আনন্দরাম বহুরূপী সাজে সেই নূর বাঈকে বাদশাহের মহল হইতে ছদ্মবেশে লইয়া গিয়া ওখলায় রাখিয়া আসিয়াছে। তখন নির্ব্বোধ কিজিলবাসের চক্ষু হঠাৎ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সে চাচীকে লইয়া কোতোয়ালীতে ফুলাদ খাঁর নিকট গেল। চাচী, ফুলাদ খাঁ ও তহমাস্প খাঁকে আনন্দরামের দুগ্ধ বিতরণ ও তরকারির ব্যবসার কথা খুলিয়া বলিল।

নূর বাঈয়ের পলায়নের সংবাদ শুনিয়া নাদির শাহ ক্রোধে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। সংবাদ শুনিয়া তহমাস্প খাঁ তাহাকে জানাইতে প্রাসাদে চলিয়া গেলেন। চাচী ও তাহার প্রাণকান্ত ফুলাদ খাঁর নজরবন্দী রহিল। চাচীর কথা সহরময় রটিয়া

গেল। কোতোয়ালীর দারোগা ফকির লুৎফ উল্লা শাহকে গ্রেপ্তার করিতে ছুটিল। আনন্দরাম আজমীর ফটক দিয়া সহর হইতে বাহির হইয়া পাহাড়গঞ্জে চলিয়া গেল।

যথা সময়ে নূর বাঈ, গোলাপী ও আক্রম জমান খাঁ ওখলার সরাইতে পৌছিলেন। পূর্ব্বের রাত্রির উৎপাতে ওখলা-নিবাসী গুজররা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। তাহাদের মণ্ডল বা চৌধুরী রমণীদিগকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী গ্রামে সরাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল কিন্তু আনন্দরামের অনুমতি ব্যতীত পদ্মিনী ও তাহার পিতামহী কোনমতেই ওখলা ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অনেক কষ্টে চৌধুরী অন্য সকল রমণীকে উটের গাড়ী করিয়া এবং সঙ্গে জাঠ সওয়ার দিয়া ফরিদাবাদের দিকে রওনা করাইয়া দিল। লক্ষ্মী, পদ্মিনী ও তাহার পিতামহী রহিয়া গেল।

চাচীর বৃত্তান্ত নাদির শাহের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি আনন্দরামকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। বুদ্ধিমতী চাচী স্থির করিয়াছিল যে পদ্মিনীকে ধরাইয়া দিলে এক তীরে দুই পাখী মারা যাইবে। প্রথম, তাহার পথের কণ্টক সরিবে। দ্বিতীয় সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরাম ধরা পড়িলে সে পুরস্কার পাইবে।

নির্ব্বোধ কিজিলবাস তাহার মতলব বুঝিল না। সে মহানন্দে ওখলা লুঠিতে হইবার দলে মিশিয়া পড়িল। চাচী তাহাকে একা ছাড়িল না। সে তাহার পরিণীতা পত্নী সাজিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া ওখলা চলিল। গুজর ও জাঠদের উপদ্রবে

অনেক ইরাণী মরিয়াছিল। নাদির শাহের হুকুমে দশ হাজার সওয়ার লইয়া আবদুল বাকী খাঁ ওখলা লুঠিতে চলিল। এ সংবাদ প্রচার হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না।

পাহাড়গঞ্জে থাকিয়া আনন্দরাম সমস্তই শুনিল। সে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া পাহাড়গঞ্জ হইতে ঘোড়া লইয়া খোলা মাঠ ও পুরাতন দিল্লীর ভিতর দিয়া নিজামউদ্দীনের সমাধির দিকে ছুটিল। কিন্তু মুসলমান সাধু নিজামউদ্দীনের সমাধিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অদূরে আগ্রার রাজপথে ধূলার মেঘ দেখিয়া আনন্দরাম বুঝিল যে ইরাণী সওয়ারদিগের পূর্ব্বে তাহার ওখলা পৌঁছিবার আশা বৃথা। সে অন্য পথ দিয়া ঘুরিয়া তোগলকাবাদের সম্মুখ দিয়া যখন ওখলার নিকটে পৌঁছিল, তখন দূর হইতে গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা দেখিয়া আনন্দরাম বুঝিতে পারিল যে সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে।

গুজ্জররা রাজপথের নিকটের গ্রাম ছাড়িয়া আশেপাশে বনে লুকাইয়া ছিল। দুই চারিজন আনন্দরামকে ঘোড়া হইতে নামিতে দেখিয়া তাহার নিকটে আসিল। আনন্দরাম তাহাদিগের মুখে শুনিতে পাইল যে গ্রামের চৌধুরী দুই তিনটি স্ত্রীলোক ব্যতীত আর সকলকেই ইরাণী সওয়ার আসিবার পূর্ব্বে লুকাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল। সে মনে করিল যে হয়ত পদ্মিনী ও লক্ষ্মী বাঁচিয়া গিয়াছে। সে দুই চারি ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া ফরিদাবাদের দিকে চলিল। দুই দিন ধরিয়া আনন্দরাম ফরিদাবাদ হইতে বল্লমগড় পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রামে পদ্মিনী ও লক্ষ্মীর সন্ধান করিয়া বেড়াইল।

গুজরদের কথা শুনিয়া সে ক্রমে বুঝিতে পারিল যে, পদ্মিনী, লক্ষ্মী ও তাহাদের পিতামহী তাহার অনুমতি ব্যতীত ওখলার সরাই পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া ইরাণীরা কেবল তাহাদিগকেই দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আনন্দরাম হতাশ্বাস না হইয়া দিল্লীর দিকে ফিরিল।

চাচীর প্রাণকান্ত পদ্মিনাকে দেখিতে পাইয়া চাচীর বিপুল প্রেম একেবারে ভুলিয়া গেল। সুতরাং চাচী পাগল হইয়া উঠিল। ওখলায় আনন্দরাম বা নূর বাঈকে ধরিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিজিলবাস সর্দ্দাররা অসহায়া রমণী তিনটিকে হত্যা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধিমান আবদুল বাকী খাঁ তাহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে দেন নাই। চাচীর কিজিলবাস পদ্মিনীকে কবিলারূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাবও আবদুল বাকী খাঁর মনঃপুত হয় নাই।

সকলেই দিল্লীর দিকে ফিরিতেছেন এমন সময়ে প্রাণকান্তের পদ্মিনার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাতে চাচী এক বিষম বিপদ বাধাইয়া বসিল। সে মাথার কাপড় খুলিয়া সর্দ্দার আবদুল বাকী খাঁর সম্মুখে যাইয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিয়া উঠিল যে কাফের রমণী তাহার ধর্ম্মপতিকে যাদু করিয়াছে। অতএব তাহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া পথিপার্শ্বের বৃক্ষশাখা হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হউক।

বিচক্ষণ সর্দ্দার চাচীকে দুই চারিটি প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, এই কাফের রমণী পদ্মিনী আনন্দরামের স্ত্রী বা উপপত্নী। তিনি চাচীর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পদ্মিনীর

ডুলীর চারিদিকে দুই শ্রেণী সওয়ার পাহারা লাগাইয়া দিলেন। তথাপি তাহার প্রাণকান্ত তাহার দিকে চাহে না দেখিয়া চাচী পাগল হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় চাচী তাহার প্রাণকান্তের দিকে এবং তাহার কিজিলবাস প্রাণকান্ত পদ্মিনীর ডুলীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে চাহিতে দ্বিপ্রহর রাত্রির সময়ে নূতন দিল্লী সহরের দিল্লী ফটকে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর হুকুমে পদ্মিনী, লক্ষ্মী ও তাহাদের পিতামহী কোতোয়ালীর সম্মুখে রৌশন উদ্দৌলার মসজেদে বন্দী রহিল। প্রভাতে সংবাদ পাইয়া শাহান শাহ নাদির শাহ হুকুম দিলেন যে নূর বাঈ অথবা আনন্দরাম আত্মসমর্পণ না করিলে তৃতীয় দিনে চাঁদনী চৌকের সম্মুখে পদ্মিনীকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে। পদ্মিনী দিল্লী পৌঁছিবার দুইদিন পরে আনন্দরাম নিজাম উদ্দীনের সমাধিপ্রান্তে এই আনন্দ সংবাদ শুনিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এনায়েৎ উল্লার প্রতিশোধ

হিন্দুস্থানী বিশ্বাসঘাতক সাদৎ খাঁর পরামর্শে নাদির শাহ লুণ্ঠনমানসে দিল্লী আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেই সাদৎ খাঁ ইরাণীর অসহ্য অত্যাচারে বিষপান করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। অনেকে মরিয়াও পরিত্রাণ পায় নাই। তাহাদের স্ত্রী-পুত্র বন্দী হইয়া পারস্য দেশে যাইবার আদেশ পাইল।

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা তখনও ধনধান্যে পরিপূর্ণ। আমাদের স্বজাতি ও স্বধর্ম্মী মারাঠা তখনও শস্যশ্যামল গৌড় দেশের ধনরত্নের সন্ধান পায় নাই। সুতরাং বাঙ্গলার উকাল-সরকার এনায়েৎ উল্লা খাঁ, তহমাস্প খাঁর নিকট হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা দিবার আদেশ পাইলেন। এনায়েৎ উল্লা খাঁ বাহাদুরের অবস্থা তখন সত্যই শোচনীয়। বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্য্যার পলায়নে তাহার মন এতদূর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল যে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইলেও তিনি কিছুই রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন নাই। পথ হইতে ইরাণী প্রহরী যখন ইরানের রাজমন্ত্রীর নিকট তাঁহাকে লইয়া গেল তখন পাঁচ লক্ষ টাকা দিবার হুকুম শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু তখনও তিনি বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার নাজিমের উকীল। সুতরাং তহমাস্প খাঁ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না।

শাহান শাহের দরবারে হাজির করিবার জন্য এনায়েৎ উল্লা খাঁ বাহাদুরকে নজরবন্দী রাখা হইল। এনায়েৎ উল্লা কারাগারে জলস্পর্শ করিল না। নমাজের আজান শুনিয়া উঠিল না। তাহা দেখিয়া সকলে স্থির করিল যে বৃদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছে।

তাহার পরদিন পদ্মিনীর কয়েদের তৃতীয় দিন। শাহান শাহ নাদির শাহ হুকুম দিয়াছেন যে জুম্মার নমাজের পূর্ব্বে আনন্দরাম বা নূর বাঈ হাজির না হইলে পদ্মিনাকে দগ্ধ করা হইবে।

সকাল বেলায় দেওয়ান-ই-আমে শাহান শাহ ও হিন্দুস্থানের বাদশাহ মহম্মদ শাহ বসিয়াছেন। দিল্লীর যে সমস্ত নাগরিক ইরাণী উজীরের হুকুমমত টাকা যোগাইতে পারে নাই, তাহা-দিগের বিচার হইতেছে। সকলের সম্মুখে শৃঙ্খলাবদ্ধ বাঙ্গলার উকাল-সরকার এনায়েৎ উল্লা খাঁ বাহাদুর দণ্ডায়মান। সহসা দরবার গৃহের সম্মুখে এক রমণী "ফরিয়াদ, ফরিয়াদ" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ইরাণী নসকচী ও হিন্দুস্থানা আহদীরা তাহাকে থামাইতে পারিল না। অবগুণ্ঠন শূন্যা এক যুবতী স্নুবর্ণের গুলালবারের সম্মুখে দাঁড়াইল। নাদির শাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কি হইয়াছে?

রমণী অমিশ্র ফারসীতে উত্তর দিল, তাহার স্বামীকে এক কাফের রমণী যাদু করিয়াছে। সেইজন্য তাহার স্বামী আর তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না। বাদশাহের বাদশাহ বিচার না করিলে সে দরবারে আত্মহত্যা করিবে।

নাদির শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার স্বামী কোথায় ?

একজন নসকচী চাচীর কিজিলবাস প্রাণকান্তকে আনিয়া শাহান শাহের সম্মুখে হাজির করিল। তখন সহসা শুষ্ক-কণ্ঠোত্থিত উন্মত্তের উৎকট অট্টহাস্যে সেই প্রাচীন ধর্ম্মাধিকরণ কম্পিত হইয়া উঠিল। চাচা তাহা শুনিয়া একবার শিহরিল। তাহার পর সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বৃদ্ধ এনায়েৎ উল্লা খাঁ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পত্নীকে দেখিয়া বৃদ্ধের শুষ্ক নেত্র হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়াছিল। কিন্তু নসকচী যখন তাহার ধর্ম্মপত্নীর উপপতিকে গুলালবারের সম্মুখে আনিল, তখন বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিলেন।

সেই মুহূর্ত্তে হিন্দুর ঈশ্বর বা মুসলমানের খোদা বৃদ্ধের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিলেন। নাদির শাহ হাস্যের শব্দ শুনিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। একজন ইরাণী নসকচী তাহাকে প্রহার করিতে আসিল।

বৃদ্ধ তাহাকে নিরস্ত করিয়া দিল্লীর বাদশাহী দরবারের রীতি অনুসারে উভয় বাদশাহকে তিনবার করিয়া কুর্ণীশ করিয়া বিশুদ্ধ ফারসীতে বলিতে লাগিল, "শাহান শাহ, মেহেরবান, আমি ধন আর যুবতী স্ত্রীর শোকে পাগল হয়েছিলাম। আপনার ইরাণী সৈন্য আমার যথাসর্ব্বস্ব লুঠে নিয়ে গিয়েছে বলে আপনার হুকুমে আমি পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে পারিনি। সেই অপরাধের জন্য আমার বিচার হবে। কিন্তু শাহান শাহ, আমার মাথার উপর, দুনিয়ার হাজার বাদশাহের উপরে আর একজন শাহান

শাহ বাদশাহ আছেন। আমার বিচারের ভার এখন তিনি নিয়েছেন। জনাব, আমি সুবা বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নাজিমের উকীল। আমার বয়স ষাট বৎসরের উপর। বাল্যকালে আমি বড় গরীব ছিলাম বলে আজীবন অর্থ সঞ্চয় করেছি। প্রথম জীবনে বড় কষ্ট পেয়েছি বলে বৃদ্ধ বয়সে সুখভোগ করবার ইচ্ছা হয়েছিল। সেইজন্য আজীবনের সঙ্গিনী বৃদ্ধা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে দিল্লীতে ঐ যুবতীকে বিবাহ করেছিলাম। শাহান শাহ, খোদার আদালতে আমার বিচার আরম্ভ হয়েছে। তোমার লোক আমার যথাসর্ব্বস্ব লুঠে নিয়ে গিয়েছে, তাই তোমাকে টাকা দিতে পারিনি বলে তুমি আমার বিচার করতে চাও। পতিপ্রাণা সাধ্বীকে পরিত্যাগ করে যে কসবীকে বিবাহ করেছিলাম, তার উপপতি তাকে গ্রহণ করছে না বলে সে তোমার কাছে বিচার চায়, তাও আবার আমার সম্মুখে! তোমার সাধ্য কি তহমাস্প কুলীন, যে আমাদের বিচার কর? একদিন যেখানে তোমার নৃশংস অত্যাচার আর অসংখ্য মুসলমান হত্যার বিচার হবে, সেইখানে আমারও বিচার হবে। তোমার মাথার উপরে চেয়ে দেখ, ইরাণের শাহান শাহ, খোদার চোখ থেকে আগুনের সমুদ্র তোমাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে।”

নাদির শাহ সভয়ে দেওয়ান-ই-আমের রত্নখচিত ছাদের দিকে চাহিলেন। সেই মুহূর্ত্তে বৃদ্ধ এনায়েৎ উল্লা খান বাহাদুর শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তে এক নসকচীর তলোয়ার লইয়া তারপর তাহার চাচীর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং বস্ত্র মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র কৌটা বাহির করিয়া বিষপান

করিল। নসকচীরা ধরিবামাত্র বৃদ্ধের মৃতদেহ দরবার গৃহের আচ্ছাদনের উপরে পড়িয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে শব দুইটি অপসারিত ও রক্ত ধৌত হইলে নাদির শাহ চাচীর প্রাণকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য বল, মৃত রমণী তোমার কে? তুমি কি একে বিবাহ করেছিলে?"

কিজিলবাস যুবা সভয়ে বলিল, "না জনাব, আমি একে বিবাহ করিনি।"

এই সময়ে সম্ভ্রান্ত আমীর বেশধারী একজন হিন্দু আসিয়া দেওয়ান-ই-আমের সম্মুখে দাঁড়াইল। আরজবেগী তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল—"ফরিয়াদ, খাস শাহান শাহের ফরিয়াদ।"

তাহার পরে সে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "শাহান শাহ,—মেহেরবান, আমি নূর বাঈয়ের পলায়নের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছি। বাদশাহ, অবলা রমণী বধ করে নিজের নাম কলঙ্কিত করবেন না। পদ্মিনীর বদলে আমাকে কোতল করবার হুকুম হ'ক।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মানব চরিত্রের আবর্ত্তন

দূরে থাকিয়া নূর বাঈ সমস্তই শুনিল। তখন সে দিল্লী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু চারিদিকে ভীষণ মূর্ত্তি কিজিলবাস অশ্বারোহী তখন জাঠের সন্ধানে ফিরিতেছে। মথুরা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত বাদশাহী সড়কে চলাফেরা একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জীর্ণ পরিত্যক্ত তোগলকাবাদ হইতে হোডল ও বল্লমগড় পর্য্যন্ত জাঠ ও গুর্জ্জর প্রাচীরবেষ্টিত গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে। সুতরাং নূর বাঈ সহস্র চেষ্টা করিয়াও দিল্লীতে ফিরিবার সঙ্গী খুঁজিয়া পাইল না।

সাহেবজাদা আক্রম জমান খাঁ ও গোলাপী আনন্দরামের পরিচারকদিগের সহিত তখনও নূর বাঈএর নিকটে ছিল। অর্থের অভাবে সাহেবজাদার নেশা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং চেতনা ফেরায় তিনি আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। নূর বাঈ আবার লোক না পাইয়া তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই দিল্লীতে ফিরিবার চেষ্টা করিল।

দীর্ঘকাল অত্যধিক মাত্রায় সুরাপান করিয়া আক্রম জমানের চিত্তবৃত্তি বিকল হইয়া গিয়াছিল। মদ্যপের বুদ্ধি স্বাভাবিক পথে পরিচালনা করিতে গিয়া নূর বাঈ প্রথমে অত্যন্ত বাধা পাইল। এই সময়ে গোলাপী আসিয়া তাহার চেষ্টার প্রতিবাদী হইল। সরলা ক্ষুদ্রবুদ্ধি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণী প্রথমে ভাবিল যে,

এই রূপসী গুণবতী মুসলমানী তাহার অকূল সমুদ্রের একমাত্র আশ্রয় মদ্যপ লম্পট অব্যবস্থিতচিত্ত সাহেবজাদাটিকে অধিকার করিতে চাহে। দুই একদিনের মধ্যে নূর বাঈ বুঝিল যে, গোলাপী তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই। সে তখন প্রাণপণ শক্তিতে দিল্লীর মার্জ্জিত উর্দ্দুতে যথাসম্ভব ভাঙ্গা বাঙ্গলা মিশাইয়া গোলাপীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, সে প্রয়োজনে নিতান্ত বাধ্য হইয়া আক্রম জমানরূপী পশুটাকে অন্তত কয়টা দিনের জন্য মানুষ করিয়া তুলিতে চাহে।

মদ যখন তাহাকে পশু করিয়া না রাখিত তখন আক্রম জমান সঙ্গীত শাস্ত্রের মর্য্যাদা বুঝিত। বিপদে পড়িয়া সুরাপান পরিত্যাগ করিয়া সে আকুলচিত্তে একটা নেশা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় কলকণ্ঠী নূর বাঈ উপযাচিকা হইয়া তাহাকে গান শুনাইতে আরম্ভ করিল। সেই কর্দ্দমলিপ্ত ধূলি-ধূসরিত গুর্জ্জর গ্রাম-প্রান্তে আম্রবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া অপ্সরা বিনিন্দিতা রূপসী যখন প্রভাতে বা মধ্যাহ্নে অথবা সন্ধ্যায় সুরজন বাঞ্ছিত সুর লহরীর সৃষ্টি করিত, তখন একে একে গুর্জ্জর-বধূ গৃহকর্ম্ম ছাড়িয়া গ্রাম-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইত। ক্রমে বংশীবাদক গোপাল ও রাখাল চারণ ছাড়িয়া, গ্রাম-বৃদ্ধ নিদ্রা ও দেবার্চ্চন পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে আসিয়া বেষ্টন করিত। হিংসায় গোলাপী প্রথম দুই একদিন আসে নাই বটে, কিন্তু তাহার পরে সে যখন দেখিল যে নূর বাঈ উপযাচিকা হইয়া কেবল গানই শুনায়, অথচ প্রেম বিতরণ করে না এবং তাহার ফলে আক্রম জমান সুরার

অভাবে ভাঙ অথবা আফিমের আশ্রয় লয় না তখন ধীরে ধীরে সেও সেই আম্রবৃক্ষতলে আসিতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একজন জাঠ একটি ভাঙ্গা সারেঙ্গী লইয়া আসিল। আক্রম জমান যখন তাহা মেরামত করিয়া লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল, তখন নুর বাঈ বুঝিল যে বাঙ্গলার এই হতভাগ্য সাহেবজাদা কেবল সমজদার শ্রোতা নহে, সে একজন সিদ্ধহস্ত বাদক। ওস্তাদে ও কলাবতীতে এক সঙ্গে যখন সঙ্গীত-সুধা বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন ক্রমে চারিদিকের সমস্ত গ্রাম হইতে শ্রোতা ছুটিয়া আসিল।

যে কলকণ্ঠ মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের অন্যতম কারণ, যে চারুনৃত্য চটুল চরণদ্বয় কর্নালের মহা কুরুক্ষেত্রের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহাবিভ্রান্ত মোগল সেনাপতিগণকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যে ক্ষুদ্র গুর্জ্জর গ্রামপ্রান্তে অশিক্ষিত গুর্জ্জর ও জাঠদিগকে মুগ্ধ করিবে, এ কথা আশ্চর্যজনক নহে। ধীরে ধীরে আক্রম জমানের চিন্তাশক্তি ফিরিতেছিল। সে ভাবিত এই অপরূপ লাবণ্যবতী মহীয়সী রমণী কে? নূর বাঈ শান্ত অপরাহ্নে যখন কানাড়া ধরে তখন সেই বিস্তীর্ণ আম্রকুঞ্জের পত্রমর্ম্মর পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া যায়। মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃতা হইয়া সে যখন তাহার কম্বুকণ্ঠের হেলনে কোন বিশিষ্টা রাগিণীর ভাব বিকাশ করিয়া ফেলে, তখন তাহার অপরূপ রূপচ্ছটায় দিগন্ত যেন সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে নূর বাঈ কেবল হাসে। ক্রমে নূর বাঈএর কিঞ্চিৎ পরিচয় আক্রম জমান যখন গোলাপীর

নিকট শুনিল, তখন তাহার শ্রদ্ধা ভক্তিতে পরিণত হইল। আক্রম জমান যখন বুঝিল যে কিন্নরকণ্ঠ বিশ্ববিজেতা নাদির শাহকে বিজয় করিয়াছে, ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে তাহা আজ ধূলিধূসর গুর্জ্জর গ্রামপ্রান্তে বিশেষ কারণে তাহার মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত।

সময় বুঝিয়া একদিন সেই আম্রকুঞ্জর প্রান্তে নূর বাঈ ললিত বিলাস পরিত্যাগ করিয়া নিজের কথা ধরিল। নূর বাঈ বলিল যে, আজ সে বখশীস্ চাহে। এতদিন ধরিয়া সে সুবা বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার ভারত বিখ্যাত সুবাদার সুজাউদ্দান খাঁ বাহাদুরের পুত্রকে গান শুনাইয়া আসিয়াছে এবং মোগল বাদশাহীর বড় দুর্দ্দিন হইলেও সে কিছু পারিশ্রমিক চাহিতে বাধ্য হইয়াছে। তখন ভয়ে নিঃস্ব আক্রম জমান কথা কহিল না।

নূর বাঈ বলিয়া যাইতে লাগিল—সে অর্থ চাহে না। খোদার অনুগ্রহে সে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। সে প্রেম চাহে না। দিল্লীতে ও হিন্দুস্থানে সে অনেক স্বার্থপর ও নিঃস্বার্থ প্রেমিক পাইয়াছে। আজ হঠাৎ এই পুরুষ-বহুল হিন্দুস্থানে একজন যথার্থ পুরুষের অভাব হইয়া পড়িয়াছে।

সহসা কোন অজ্ঞাত কারণে বাগদেবী আসিয়া সেই অমানুষ মদ্যপ, লম্পট নবাবপুত্রের কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইলেন। আকুল কণ্ঠে আক্রম জমান বলিয়া উঠিল, "বিবি, আমি আপনার গোলাম। আমি এতদিন পশু ছিলাম কিন্তু আপনি

আমাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। আমি আমার এই ব্যর্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াও আপনার যদি কোনও কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।”

নূর বাঈ ঈষৎ হাসিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, নিঃস্বার্থ পরোপকারী আনন্দরাম হিন্দু হইয়াও জীবন পণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। এখন মুসলমানী বেশ্যাকে কারামুক্ত করায় তাহার জীবন যাইতে বসিয়াছে। সুদূর বঙ্গদেশে তাহার আত্মীয়স্বজন আছে, তাহার জন্য কাঁদিবার লোক আছে, সুতরাং তাহার জীবনের মূল্য আছে। কিন্তু নূর বাঈ একজন অজ্ঞাতকুলশীলা বেশ্যা। সে মরিলে কেবল তাহার প্রেমিক সম্প্রদায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবে এবং দুই একজন ওস্তাদ ও কলাবৎ বিলাপ করিবে। সে কেবল ভয়ে এবং তাহার তুচ্ছ জীবনের মায়ায় বশীভূত হইয়া আনন্দরামকে এই বিপদে ফেলিয়াছে। এখন সে নিজকৃত পাপের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছে। সাহেবজাদার নিকট সে এই মাত্র পারিশ্রমিক চাহে যে, তিনি দয়া করিয়া তাহাকে নাদির শাহের দরবারে উপস্থিত করিয়া দিন।

সহসা মানুষ আক্রম জমান বলিয়া উঠিল, “আলবৎ বিবি সাহেব, জীবন্ত অবস্থায় যদি তোমাকে পৌঁছাতে না পারি, তাহলে মৃত অবস্থাতেও তোমাকে দরবার-ই-আমে পৌঁছে দেব।”

সেইদিন হইতে কিন্নরকণ্ঠের গীত অভাবে গুর্জ্জর গ্রাম-প্রান্তের চিরস্তব্ধ আম্রকুঞ্জ আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল। দলে

দলে গুর্জ্জর, আহীর ও জাঠ শ্রোতা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল।

গোলাপী কাঁদিল। তারপর আক্রম জমানের পা জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু সে কিছুতেই নিশ্চিত মরণের পথযাত্রী দুইটিকে ফিরাইতে পারিল না। দুইটি ঘোড়া লইয়া আক্রম জমান ও নূর বাঈ দিল্লার পথ ধরিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিচার

দরবারে আনন্দরাম আবার বলিল, "শাহান শাহ, আমি সুবা বাঙ্গলার লোক, মোগল বাদশাহের আশ্রিত। আমার পরিচয় মেহেরবান্ কদরদান্, মহম্মদ শাহ বাদশাহ গাজীর নিকট অজ্ঞাত নয়।"

বিস্মিত হইয়া নাদির শাহ মোগল-কুল-কলঙ্ক মহম্মদ শাহের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "আনন্দরাম রায় সুবা বাঙ্গলার আমীর এবং খাস দরবারের দরবারী।"

নাদির শাহ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মহম্মদ শাহের প্রভুভক্ত ভৃত্য হয়ে এমন কাজ করতে গেলে কেন?"

আবার তিনবার কুর্নিশ করিয়া আনন্দরাম বলিল, "শাহান শাহ, নর্তকী নূর বাঈ আমার বহু উপকার করেছে। তাকে যখন বাদশাহী মহলে কয়েদ করবার হুকুম হ'ল, তখন সে ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে আমার শরণাগত হয়েছিল। সেই জন্য তাকে ইরাণী সৈন্যের অধিকারের সীমা পার করে রেখে এসেছি।"

"তুমি তাকে খুঁজে এনে দিতে পার!"

"শাহান শাহ, মুক্তি পেলে আমি তার সন্ধান করতে পারি। কিন্তু সে যদি স্বেচ্ছায় না আসে, তাহ'লে তাকে আনতে পারব না।"

"বাঙ্গালী কাফের, এর শাস্তি কি জান?"

"শাহান শাহ দীন ও দুনিয়ার মালিক। আপনার হুকুমে কত বাদশাহ শাহজাদার মুণ্ড দিল্লীর পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে, আমি ত কোন্ ছার। যার মৃতদেহ এখানে পড়ে আছে, বাঙ্গলার উকীল সরকার এনায়েৎ উল্লা খাঁ বাহাদুর জীবিত থাকলে বলতে পারতেন, আনন্দরাম রায় কোন্ বংশের লোক। মেহেরবান্, অনেক দিন ধরে এই মাথাটা কাঁধের উপরে বড় ভার বোধ হয়েছে। সেটা হুজুর দরবারে হাজির হয়ে সওগাত দিতে স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয়েছি।"

নাদির শাহ আশ্চর্য্য হইয়া এই বিনয়ী অথচ দৃঢ়চিত্ত যুবার মুখের দিকে চাহিলেন। হঠাৎ তাঁহার আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাফের, তুমি নিজের ইচ্ছায় ধরা দিয়েছ কেন? তুমি যে তিনটি স্ত্রীলোকের মুক্তির জন্য ধরা দিয়েছ, তারা তোমার কে?"

"জনাব-ই-আলা, তারা আমার কেউ নয়।"

"কাফের, জল্লাদের হাতে মৃত্যু তোমার সম্মুখে। হিন্দুস্থানী কাফেরের যদি ঈশ্বর থাকে, তাহ'লে তার পবিত্র নাম স্মরণ করে বল, এই তিনটির মধ্যে যুবতীটি তোমার উপপত্নী কি না?"

"শাহান শাহ, হিন্দুর কোটি কোটি দেবতার নামে শপথ করে বলছি, এই তিনটি রমণী পাঞ্জাবী ভদ্র বংশ-জাতা, এরা কসবী নয়। আমি পিতৃমাতৃহীন আত্মীয় স্বজন বিরহিত বলে এরা আমাকে পুত্রের মত ও ভ্রাতার মত যত্ন করেছেন। মাতৃ-বিয়োগের পরে এত যত্ন কোথাও পাইনি। সেইজন্য আমি তাঁদের বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করবার চেষ্টা করেছিলাম।

মেহেরবান্, সকল ভাষায় কৃতজ্ঞতা বলে একটা শব্দ আছে। আনন্দরাম রায় রূপের মোহে এই বৃদ্ধা ও তার পৌত্রী ছুটিকে রক্ষা করতে যায় নি। বৃদ্ধার অপূর্ব্ব স্নেহ এবং তার পৌত্রী ছুটির স্বর্গীয় ভালবাসায় এই সুদূর প্রবাসে আনন্দরাম রায় তাদের ক্রীতদাস হয়ে ছিল।”

“দেখ কাফের, যুবতী তোমার উপপত্নী হ'ক্ বা না হ'ক্, তাতে আমার প্রয়োজন নেই। নর্ত্তকী নূর বাঈকে আমার প্রয়োজন। তুমি যদি তাকে পৌঁছে দিতে পার, তা হ'লে তোমরা সকলে মুক্তি পাবে।”

পূর্ব্বেই বলেছি শাহান শাহ, অনুমতি পেলে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু নূর বাঈ যদি না আসে?”

“তোমার সঙ্গে বাদশাহী নসকচী ও হাজার সওয়ার দিচ্ছি।”

“বলের আবশ্যক নেই জনাব, আপনার এলাকার বাইরে আনন্দরাম রায় একাই সহস্র। এই লক্ষ লক্ষ কিজিলবাস মোগল, তাতার সেনার মধ্য হ'তে একা আনন্দরাম রায় এই চারটি নারীকে মুক্ত করে দিয়েছিল।”

“তুমি একা?”

“শাহান শাহ, আমি একা।”

“এখন তুমি একা দিল্লী থেকে পালাতে পার?”

“শাহান শাহের মেহেরবাণী হ'লেই পারি। তবে তিনটি সর্ত্ত আছে। প্রথম আমাকে দরবার থেকে নিয়ে গিয়ে কয়েদ-খানায় আটক করা হবে, কেউ আমার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করবে না। দুসরা, আমি পালাতে পারলে শাহান শাহ, রমণী

তিনটিকে সাজা দেবেন না। তিসরা, নূর বাঈ যদি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে আসে, তাহ'লে আমাকে মুক্তি দিন আর না দিন, আগে রমণী তিনটিকে মুক্তি দেবেন।"

"বখশীদম, তাই হবে।"

নাদির শাহের ইঙ্গিতে দশ জন সশস্ত্র নসকচী আনন্দরামকে বেষ্টন করিয়া কারাগারে লইয়া গেল। বাদশাহী দরবারের সমস্ত কথা প্রতিদিন লিপিবদ্ধ হইত। যে কর্ম্মচারী এই কার্য্য করিত, তাহার উপাধি "খাস ওয়াকিয়া নিসার।" সে দিনের বিবরণ লিখিতে গিয়া সে লিখিল যে ইরাণী বাদশাহের প্রার্থিত অর্থদণ্ড দিতে না পারিয়া ইরাণী নসকচীর অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠায় বাঙ্গলার উকীল-ই-সরকার এনায়েৎ উল্লা খাঁ বাহাদুর সপরিবারে আত্মহত্যা করিয়াছেন। দিল্লীর চুড়ি-ওয়ালী গলির চাচী, তাহার প্রেমপাত্র কিজিলবাস যুবা এনায়েৎ উল্লার দিব্যদৃষ্টিলাভ এবং চাচীর হত্যা তাহাতে স্থান পাইল না। মোগলের সরকারী ইতিহাস এইভাবে লিখিত হইত।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বহুরূপী

শাহান শাহের দরবারে আনন্দরাম যে ভাবে সে দিন কথা কহিয়া আসিল, তাহাতে কিজিলবাস ও ইরাণী মহলে তাহার খাতির জমিয়া গেল। তাহার উপর তাহাকে যখন সাধারণ কয়েদখানায় না লইয়া গিয়া পুরাতন দিল্লীর কাবুল দরওয়াজার পার্শ্বে আলিমর্দ্দান খাঁর প্রাসাদে রাখা হইল, তখন দিল্লীর সকল লোকই মনে করিল যে, বাঙ্গালী আমীর আনন্দরাম রায় রাজা মহারাজার মত খাতির পাইয়াছে। সহরের মহল্লায় মহল্লায় মশহুর হইয়া গেল যে নূর বাঈকে উধাও করিয়া লইয়া গিয়াছে বলিয়া শাহান শাহ আনন্দরামকে নজরবন্দী মাত্র করিয়াছেন। তখন ভারতবর্ষে বিশেষতঃ দিল্লীতে হিন্দুস্থানী মুসলমানের এমন দুরবস্থা হইয়াছিল যে, যখন গুজব উঠিল যে, এতদিন হেলিয়া দুলিয়া প্রজাপতি উড়াইয়া দিয়া নূর বাঈ গোলাপ অবশেষে এক বাঙ্গালীর সঙ্গে মজিয়াছে, তখন নূর বাঈয়ের মাশুকের দল কেহ তাবিজ কিনিল, কেহ বা নিজামুদ্দিন অথবা কুতুব শরিফে চিল্লা বাঁধিতে গেল। অবশিষ্ট দুই এক জন প্রকাশ্য রাজপথে 'হায় হায়' করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল।

কারারুদ্ধ হইয়া আনন্দরাম প্রথম দিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিল না। মুসলমানে তাহার খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছিল বলিয়া সে তাহা স্পর্শও করিল না। এই সংবাদ এক ঘণ্টার মধ্যে

নূতন দিল্লীর কোতোয়াল কুলাদ খাঁর নিকট পৌঁছিল। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। নিশ্চয়ই শাহান শাহ নাদির শাহ আনন্দরাম সম্বন্ধে কড়া হুকুম দিয়াছিলেন। কারণ, চাহিবামাত্র সে রন্ধনের ব্রাহ্মণ, জল তুলিবার ব্রাহ্মণ, বাসন মাজিবার হিন্দু চাকর পাইল।

নূর বাঈয়ের পলায়নে কুলাদ খাঁ সাবধান হইয়া গিয়াছিল। সে চৌকীর জমাদারকে বার বার করিয়া সাবধান করিয়া দিয়া গেল যে, রাত্রিকালে বন্দী অথবা তাহার কোন পরিচারক যেন ঘরের বাহির হইতে না পারে এবং প্রত্যেককে যেন রাত্রিতে স্বতন্ত্র ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখা হয়। দিনের বেলায় সমস্ত দিন যেন দরজায় ও ছাদে পাহারা থাকে।

সন্ধ্যা বেলায় আনন্দরাম স্নান করিয়া ভোজন করিলেন। তারপর ব্রাহ্মণকে মুসলমান জমাদারের সম্মুখে মৎস্য আনিবার জন্য একটি আসরফা দিলেন। তাঁহার পরিচারক কার্য্য শেষ করিয়া ছুটি চাহিল। জমাদার তাহাতে আপত্তি করিল না। সে যখন গেল তখন জমাদার যদি তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিত, তাহা হইলে তাহার নিজের মাথাটা পরে বাঁচিতে পারিত।

প্রভাতে উষাকালের নমাজের আজান পড়িবার পূর্ব্বে আনন্দরামের পরিচালক ও ব্রাহ্মণ দুইটি ঘোড়া লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরে আনন্দরামের কার্য্যকলাপ দেখিয়া চৌকীর সিপাহীরা বিস্মিত হইয়া জমাদারকে ডাকিয়া তুলিল।

আনন্দরাম উষাকালে স্নান করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করিল। আলীমর্দ্দান খাঁর প্রাসাদের অঙ্গনে প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া সে হোম করিতে বসিল। হঠাৎ তীব্র কাশ্মীরী আরকের গন্ধে কিজিলবাস ও ইরাণী সিপাহী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল, যে মহামূল্য দ্রব্য খোদা মানব কণ্ঠের জন্য সৃষ্টি করিয়াও নিষেধ করিয়াছেন এই উন্মাদ কাফের তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নষ্ট করিতেছে। জমাদার দেখিয়া বুঝিল যে এই দুষ্ট কাফের পলাইবার চেষ্টায় ভূত-প্রেত ডাকিতেছে।

আবার কুলাদ খাঁর নিকট খবর গেল। তিনি দূর হইতে আনন্দরামের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া ডবল পাহারার হুকুম দিয়া গেলেন। তারপর সহরে ফিরিয়া দুই চারিজন হিন্দু পণ্ডিতকে ডাকিয়া বুঝিলেন যে ইহা ভূতের পূজা নহে। হিন্দুর এক দেবতার পূজা। তথাপি আনন্দরাম যাহাতে ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া না যায় তাহার জন্য ছাদের উপরে শক্ত জাল টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল।

দ্বিপ্রহরেও হোম চলিতে লাগিল। অগ্নিতে দিবার কাশ্মীরী আরক ফুরাইয়া গেল। যে ব্রাহ্মণ মৎস্য কিনিতে গিয়াছিল, সে আবার আসরফী লইয়া বাজারে গেল। সে যখন চারি ঝাঁকা চামড়ার বোতল আনিল তখন ডবল পাহারা পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। পুরা এক বোতল আরক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া জাল পোড়াইয়া দিল। জমাদার যখন জাল রক্ষা করিতে রত, সেই সুযোগে একজন

ব্রাহ্মণ প্রসাদ বণ্টন করিতে গেল। কিজিলবাস ও ইরাণী পরমানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিল। কারণ তাহা ছাগ ও মেষ মাংসের কোপ্তা ও অপর্য্যাপ্ত সুরা।

জমাদার ফিরিয়া আসিতে আসিতে প্রসাদ শেষ হইয়া গেল। তখন জমাদার বিপদ গণিল। কারণ পাহারায় মদ্য পান নিষিদ্ধ ছিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তীব্র কাশ্মীরী আরক পুষ্পিত হইয়া ফলবান হইল। সিপাহীরা কেহ নিদ্রিত হইয়া পড়িল। কেহ বা গান ধরিল। এমন লোক রহিল না যে কুলাদ খাঁর নিকট সংবাদ লইয়া যায়।

তখনও হোম চলিতেছে। অন্ধকার অবতরণে প্রসাদ নিয়মিতরূপে সকল লোকের নিকট আসিয়া পৌঁছিতেছে। জমাদার দেখিল যে আনন্দরাম তখনও হোম করিতেছেন।

হঠাৎ নীচে এক কক্ষে সারঙ্গী বাজিয়া উঠিল। তাহার সহিত রমণী কণ্ঠে গজল গীত হইল। জমাদার আশ্চর্য্য হইয়া নীচে নামিয়া আসিল। অন্ধকারে কে তাহাকে ধরিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। যে ব্রাহ্মণ অন্ধকারে আনন্দরাম সাজিয়া হোম করিতেছিল সে উঠিয়া আসিল। আনন্দরাম জমাদারকে হোমকুণ্ডের সম্মুখে বসাইয়া বাকী প্রসাদ বাঁটিয়া দিল। প্রথম প্রহর রাত্রিতে যখন পাহারার বদলী আসিল তখন তাহাদের জমাদার দেখিল যে, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। পাহারার সমস্ত সিপাহী নেশায় অচেতন। কেবল জমাদার হিন্দু সাজিয়া রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া ভস্মস্তূপের সম্মুখে বসিয়া আছে।

তৎক্ষণাৎ কুলাদ খাঁর নিকটে সওয়ার ছুটিল। তিনি আসিয়া দিনের পাহারার জমাদারের নিকট সকল কথা শুনিলেন। তাঁহার হুকুমে হাজার সওয়ার চারিদিকে বিভক্ত হইয়া মথুরার পথে ছুটিল।

শাহান শাহের নিকট খবর গেল যে বাঙ্গালী আমীর আনন্দরাম রায় পাহারার সিপাহীদিগকে মাতাল করিয়া পলাইয়াছে।

জমাদারের প্রাণদণ্ড হইল। আর সিপাহীরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কোতোয়ালীর কারাগারে পড়িয়া রহিল।

আনন্দরাম কিন্তু মথুরার পথে যায় নাই। সে সহরতলী দিয়া ফিরিয়া আসিয়া পাহাড়ীধিরাজে আশ্রয় পাইয়াছিল। ইহারই মধ্যে ব্রাহ্মণ দুইজন ও পরিচারক তাহার ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ তাহারা কাঙ্গড়ার ব্রাহ্মণ এবং জ্বালামুখীর উপাসক শাক্ত। তাহাদিগকে আচকুয়ায় পাঞ্জাবীদেব মধ্যে রাখিয়া আনন্দরাম নিজে আজমীর ফটক দিয়া নূতন দিল্লীতে প্রবেশ করিল।

পথে চলিতে চলিতে সে উপরের পোষাকটা খুলিয়া ফেলিল। তাহার অঙ্গে তখন চারিপ্রস্থ পোষাক ছিল। সে যে পোষাক পরিয়া দরবারে গিয়াছিল, তাহা জমাদারকে পরাইয়া দিয়াছিল। তাহার নিম্নে মুসলমানী পোষাক ছিল। সে এখন মুসলমানী পোষাক ছাড়িয়া হিন্দু রমণী সাজিল। তারপর আনন্দরাম পূর্ব্বের বাসায় গিয়া প্রতিবেশীদের নিকট নিজের পরিচয় দিয়া পদ্মিনী ও লক্ষ্মীর সংবাদ লইল। সে শুনিল যে পদ্মিনী ও

লক্ষ্মী সহরের ভিতর ফতেপুরী মসজেদে আবদ্ধ আছে।

সেই রাত্রে আনন্দরাম প্রতিবেশীদের নিকট হইতে একটি সারেঙ্গী লইয়া ফতেপুরী মহল্লায় গেল। তারপর মসজেদের দুয়ারে বসিয়া সে গান গাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। কতকগুলি গান ফারসী গজল। একটি হিন্দী আর মাঝে এক একটা বাঙ্গলা গান। ক্রমে ফতেপুরী মসজেদের দক্ষিণ দিকে সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একটা বড় বাড়ীর বাতায়ন পথে প্রদীপ জ্বালিয়া উঠিল। তারপর প্রদীপ আবার সরিয়া গেল।

আনন্দরাম এই সঙ্কেত বুঝিল। সে যখন লক্ষ্মীদের বাড়ীতে থাকিত, তখন সে এসরাজ বা সারেঙ্গী বাজাইয়া গান গাহিত। সে লক্ষ্মীকে একটা বাঙ্গালা গান শিখাইয়াছিল। রাত্রি শেষ হইলে সে গা ঢাকা দিয়া মসজেদের এক কোণে পড়িয়া রহিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

জিন

প্রভাত আসিল। অশেষ দুরবস্থা সত্ত্বেও দিল্লীর পথে অসংখ্য দোকান খুলিতে আরম্ভ করিল। বণিক দোকান খুলিল। কুঞ্জী বাড়ী বাড়ী ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। আনন্দরাম বেলায় উঠিয়া বুরখা ঢাকা দিয়া ফতেপুরী মসজেদের চারিদিকের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। শেষ রাত্রিতে যে বৃহৎ অট্টালিকার বাতায়নে প্রদীপ জ্বালিয়া আবার সরিয়া গিয়াছিল, তাহার দুয়ারে গিয়া আনন্দরাম দেখিল যে সেখানে কোতোয়ালীর পাহারা দাঁড়াইয়া আছে। অনেক মিনতি করিয়া ও ভিক্ষা চাহিয়া সে কেবল গালি খাইল। একজন সিপাহী তাহাকে একপাটি ছেঁড়া জুতা ছুড়িয়া মারিল। কিন্তু তাহাতেও সে সরিল না। পথের ধূলায় বসিয়া বুরখার ভিতর হইতে সারেঙ্গীটা বাহির করিয়া সে গজল গাহিতে আরম্ভ করিল।

তাহার গান শুনিয়া গলিতে লোক জমিয়া গেল। সিপাহী চারিজন পরমানন্দে খাটিয়ার উপরে বসিয়া সঙ্গীতসুধা পান করিতে আরম্ভ করিল। কেহ দেখিল না যে পদ্মিনী ও লক্ষ্মী উপরের বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গজল শেষ হইলেই আনন্দরাম হঠাৎ একটা বাঙ্গলা গান ধরিল। সেটা কৃষ্ণবিষয়ক। গোকুলের ধূলা উড়াইয়া ব্রজের পথে গোধন যখন গৃহে ফিরিবে, তখন শ্যামের বাঁশী বাজিয়া উঠিবে।

তখন গোপাল-ললনার মন আকুল হইয়া যমুনা পুলিনের মালতী বিতানে ছুটিবে, ইত্যাদি।

স্পষ্ট বাঙ্গলা কথায় কৃষ্ণবিষয়ক গান গাহিয়া তারপর আনন্দরাম একটি হিন্দী গান ধরিল। দুই একজন তাহার সম্মুখে, দুই একটা পয়সা ফেলিয়া দিল। সিপাহীরা কুৎসিৎ পরিহাস করিতে আরম্ভ করিল। আনন্দরাম ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

সমস্ত দিন সে কি করিল তাহার সন্ধান কেহ রাখিল না। যে কিজিলবাস যুবা তাহার যৌবনের ভরা-হৃদয়ের প্রেম প্রথমে স্বর্গগতা চাচীর চরণে সমর্পণ করিয়া পরে পদ্মিনীর প্রতি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আনন্দরামের দুর্ভাগ্যবশতঃ, সে গলির ভিতরে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল। আনন্দরামকে সে চিনিতে পারে নাই বটে, কিন্তু পদ্মিনী যখন বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন কিজিলবাস তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। দেখিয়াই তাহার ক্ষুধা আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

গান শেষ হইলে সে সিপাহী চারিজনের সহিত আলাপ করিতে বসিয়া গেল। সে এক প্রহর ধরিয়া তাহাদের হুকায় তামাক খাইল। সিপাহীরা কোতোয়ালীর সিপাহী। সুতরাং ভারতবাসী। তাহারা নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া নাদির শাহের সিপাহীকে খাতির করিল। কিজিলবাস যখন তাহাদের অনুমতি না লইয়াই উপরে উঠিয়া গেল এবং লক্ষ্মী, পদ্মিনী ও তাহাদের পিতামহীকে ঘরের বাহিরে আসিতে অনুমতি করিল, পাহারার

সিপাহীরা তাহতে কোনই আপত্তি করিল না। পদ্মিনী ও লক্ষ্মী আপাদমস্তক বস্ত্র জড়াইয়া তাহার হুকুমে ঘরের বাহিরে আসিল। কিজিলবাস সেই দূর দৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল।

আনন্দরামের গলার আওয়াজ পাইয়া এবং তাহার বাঙ্গলা গান শুনিয়া অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই লক্ষ্মী ঘরের ভিতর নৃত্য করিতেছিল। কিজিলবাস যখন উপরে আসে, তখন সে তাহাদের কথা না বুঝিতে পারিলেও, এটা বুঝিয়াছিল যে, বন্দিনীদের কোন উল্লাসের কারণ হইয়াছে। সে নীচে নামিয়া গিয়া কোতোয়ালীতে চলিয়া গেল এবং বিকাল-বেলায় কুলাদ খাঁর নিকট হইতে সেই বাড়ীতে পাহারায় থাকিবার হুকুম লইয়া ফিরিয়া আসিল।

প্রতিশ্রুতি অনুসারে আনন্দরাম আলীমর্দ্দান খাঁর প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিলেও নাদির শাহ পদ্মিনী প্রভৃতির উপরে কোন অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু ভয় পাইয়া কোতোয়াল কুলাদ খাঁ ফতেপুরী মহল্লায় পাহারা বসাইয়া দিলেন। চারিজন সিপাহী পদ্মিনীদের বাড়ীতে বসিয়া থাকিত। এখন তাহাদের উপরে ষোলজন সওয়ার চারিদলে বিভক্ত হইয়া দিনরাত্রি ফতেপুরী মহল্লার চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। অপরাহ্নে পাহারা বদলাইয়া গেল। পদ্মিনীদের বাড়ীর চারিজন সিপাহীর পরিবর্ত্তে পাঁচ জন আসিল।

তাহারা আসিবার অল্পক্ষণ পরেই গলির মোড়ে একজন মেওরাটী সাপুড়ে তুবড়ী বাজাইয়া সাপ খেলাইতে আরম্ভ

করিল। দুই এক বাড়ী সাপ খেলাইয়া সাপুড়ে অযাচিত ভাবে পদ্মিনীদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বসিয়া গেল। তাহারা ছিল সংখ্যায় চারিজন। কিন্তু কেবল একজন বসিল। বাকী তিনজন পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। ফতেপুরী মহল্লা জনাকীর্ণ কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এতক্ষণ ধরিয়া তুবড়ী বাজনা শুনিয়াও গলিতে লোক জমিল না। পাহারার সিপাহীরা যদি তখন খাটিয়া ছাড়িয়া বাহির হইত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে গলির বাহিরে প্রত্যেক মোড়ে দুই জন সশস্ত্র হিন্দু অশ্বারোহী দাঁড়াইয়া আছে।

সাপ খেলাইতে খেলাইতে হঠাৎ সাপুড়ে তুবড়ী বাজান বন্ধ করিল। বৃহদাকার কৃষ্ণসর্প গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তখন পিছনের একজন বাঁশের বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। সর্প মোহিত হইয়া বাজনার তালে তালে দুলিতে লাগিল।

বাঁশীর রব শুনিয়া লক্ষ্মী ছুটিয়া বাতায়নে আসিল। তাহাকে দেখিয়া বংশীবাদক ঈষদ হাসিল। লক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল। হঠাৎ বংশীরব থামিল। সাপুড়ে সাপ ঝাঁকায় বন্ধ করিয়া ফেলিল। চকিতের মধ্যে চারিজন সাপুড়ে লাফাইয়া খাটিয়ার উপরে গিয়া বসিল। তাহারা ছিল চারিজন কিন্তু সিপাহীরা ছিল পাঁচজন। সুতরাং সিপাহীদিগকে আয়ত্ত করিতে তাহাদের সময় লাগিল। একজন হিন্দুস্থানী সিপাহী চিৎকার করিয়া উঠিল। তখন পদ্মিনী, লক্ষ্মী ও তাহাদের পিতামহী প্রস্তুত হইয়া নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুইজন সিপাহী জখম হইল। একজন সাপুড়ের মাথার পাগড়ী খুলিয়া যাইতে তাহার পরচুল খুলিয়া পড়িয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া কিজিলবাস চিনিল এবং উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল। কারণ সে আনন্দরাম।

আনন্দরাম ও তাহার সঙ্গীরা পাঁচজন সিপাহীকে আয়ত্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তাহাদের চোখও মুখে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া তাহারা লক্ষ্মী, পদ্মিনী ও তাহাদের পিতামহীকে পুরুষের পোষাক পরাইয়া বাড়ীর বাহিরে লইয়া গেল।

পল্লীর হিন্দু বা মুসলমান কেহই সিপাহীদের সাহায্য করিতে আসিল না। গলির মোড়ে যে কয়জন সওয়ার দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা আনন্দরামের দলকে বাহির হইতে দেখিয়া সরিয়া পড়িল। মসজেদের পশ্চিম দিকে একজন সওয়ার সাত আটটা ঘোড়া লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আনন্দরাম ও তাহার সঙ্গীরা তাহার নিকটে গিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বসিল। আনন্দরাম পদ্মিনীকে তাহার পিছনে উঠাইয়া লইল। বাকী দুইজন তাহার পিতামহী ও লক্ষ্মীকে নিজেদের পিছনে লইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। অন্ধকারে কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিল না। তাহারা ঘোড়া ছুটাইয়া কাবুল দরওয়াজার দিকে চলিয়া গেল।

কাবুল দরওয়াজায় পৌঁছিবার পুর্ব্বে দলের পশু ও মানুষের একটা ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ঘোড়াগুলি পথের অন্ধকারে খচ্চর হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোকগুলি তাহাদের পৃষ্ঠে ময়লা কাপড়ের বস্তা ও পুরুষগণ সংখ্যায় দুইজন ও রজক হইয়া

দাঁড়াইল। তাহারা নির্ব্বিঘ্নে কাবুল ফটক পার হইয়া কর্নাল ও লাহোরের পথে বাহির হইয়া গেল। তাহারা ফটকের আলো ছাড়িয়া কিছু দূরে চলিয়া যাইবার পরে অন্ধকার হইতে অনেক লোক আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। দুইজন রজকের মধ্যে একজন খচ্চর লইয়া দিল্লী সহরে ফিরিয়া গেল। সে পাহাড়ীধিরাজের একজন গুজ্জর [illegible] সে সাপ খেলাইতে জানিত। যাহারা ফটকের বাহিরে ছিল, তাহারা সকলেই পাহাড়গঞ্জ ও জয়সিংহপুরার হিন্দু। তাহারা আনন্দরামকে সহর ঘুরিয়া তাহাদের গ্রামে যাইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু আনন্দরাম তাহাদিগের মধ্যে মাত্র একজনকে লইয়া লক্ষ্মী, পদ্মিনী ও তাহাদের পিতামহীর সহিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

দিল্লীর সহরময় যখন সোরগোল উঠিল যে, বাঙ্গালী জীন হাওয়া হইয়া উড়িয়া গি[illegible] এবং নিজের হিন্দু কস্‌বাগুলিকেও লইয়া গিয়াছে, তখন [illegible] ও মুসলমানে একটা দাঙ্গা হইবার উপক্রম হইল। পাহাড়গঞ্জ, পাঁচকুয়া প্রভৃতি স্থানের পাঞ্জাবী হিন্দুরা বলিতে আরম্ভ করিল, যে বাঙ্গালী আমীর আনন্দরাম রায় কালীমাতার পূজা করিয়া দেবানুগ্রহে অদৃশ্য হইয়া বৃদ্ধা হিন্দু কুলমহিলা এবং তাহার অনাথা পৌত্রী দুইটিকে নরক সদৃশ ইরাণী মুসলমানের প্রেম সম্ভাষণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু দিল্লীর দীর্ঘশ্মশ্রু দীর্ঘকায় পাঠান, সৈয়দ ও মোগল বৃদ্ধরা একবাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল যে, বাঙ্গালী আমীর হয় শয়তান, না হয় জীন। কারণ সে যে ভাবে নিশানা না রাখিয়া স্ত্রীলোক তিনটিকে লইয়া গিয়াছে, তাহা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ফলকথা আনন্দরাম, লক্ষ্মী, পদ্মিনী ও তাহাদের পিতামহী দিল্লী হইতে পরিষ্কার সরিয়া গেল। হিন্দুস্থানী রমণীরূপের নিদর্শন সংগ্রহে উৎসুক একদল কিজিলবাস সেই সময় দিল্লীর মহল্লায় মহল্লায় ছড়াইয়া পড়ায় সেই সময়ে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ সহসা মিটিয়া গেল। কারণ বিদেশীয় যখন ভারতবর্ষে রমণী-রূপের সন্ধানে নির্গত হয়, তখন তাহারা সৈয়দ বা মোগল বাছিয়া রাখিয়া কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়পত্নীগুলিই লইয়া যায় না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আনন্দরাম ও তাহার সঙ্গী যখন দিল্লী হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাদশাহী শড়ক প্রায় এক ক্রোশ বামে রাখিয়া চলিতেছিল, তখন আনন্দরামকে চিনিয়া উঠা দুঃসাধ্য। তাহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু, হজ-প্রত্যাগত মুসলমানের উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ এবং প্রকাণ্ড পাগড়ী দেখিয়া কেহই তাহাকে সুবা বাঙ্গলা, চাকলা মুর্শিদাবাদনিবাসী বাঙ্গালী বাবু বলিয়া চিনিতে পারিল না। লক্ষ্মীর পিতামহী ও পদ্মিনী সবুজ রঙের মুসলমানী পোষাক পরিয়া, মাথায় একটী সবুজ রংয়ের তাজ দিয়া মুখ খুলিয়া যাইতেছিল।

দ্বিপ্রহরে প্রখর আতপতপ্ত শূন্য রাজপথে হঠাৎ সারেঙ্গী বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চিরাতৃপ্ত বাসনা-প্রমথিত হৃদয়ের প্রবল তৃষ্ণাদীপ্ত মখ্‌ফীর গজল ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। আলমগীরের চিরকুমারী কন্যা জেবউন্নিসা বেগম চিরসঞ্চিত কলুষ রাশির প্রায়শ্চিত্ত রূপে যে সঙ্গীত-সুধা লহরী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, ধূলি-ধুসরিত জনশূন্য রাজপথে কে তাহা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল? সে কণ্ঠস্বর আনন্দরামের পুরুষ সঙ্গী ব্যতীত আর সকলেরই পরিচিত। লক্ষ্মী আনন্দরামের মুখের দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে হাজীর দল বিনা বাক্যব্যয়ে রাজপথের দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরাইল। তাহারা যখন বাদশাহী সড়কে পৌঁছিল, তখন আনন্দরামের চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতেছে।

তালকুঞ্জের স্বল্প ছায়ায় মলিন বেশধারী এক উজ্জ্বলকান্তি যুবা বসিয়া সারেঙ্গ বাজাইতেছিল। তাহার পার্শ্বে বসিয়া এক

অপরূপরূপসী কোকিল বিনিন্দিত কণ্ঠে গীত গাহিতেছে। তখন আনন্দরাম ভুলিয়া গেল যে, সে হজ-প্রত্যাগত অশীতিপর বৃদ্ধ মুসলমান। লক্ষী ভুলিয়া গেল যে সে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান কুলকুমারী। এক লম্ফে আনন্দরাম অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই পুরুষ ও রমণীর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইল। কিন্তু ভিখারিণীরূপী নূর বাঈ তাহাকে চিনিতে পারিল না। সে বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সাহেব, সাহেব, আমি ভিখারিণী। আপনার কন্যার বয়সী।"

আনন্দরাম যখন উচ্ছসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বহিন তুমি যদি ভিখারিণী হও, তাহলে আমিই তোমাকে ভিখারিণী করেছি। তোমায় বাদশাহের দৌলত থেকে ছিনিয়ে এনে আমিই তোমাকে পথের ধুলায় বসিয়েছি।

তখনও নূর বাঈ তাহাকে চিনিতে পারিল না। এই অবসরে লক্ষ্মী অনেক কষ্টে তাহার ঘোড়া হইতে নামিয়া যখন তাহার ক্ষুদ্র হস্ত তুইটি দিয়া নূর বাঈয়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিল তখন সাহেবজাদা আক্রম জমান খাঁ বলিয়া উঠিলেন, "বাবুজী!"

আনন্দরাম তখন ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "জনাব, এ কি? আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

তখন নূর বাঈয়ের চক্ষু দিয়া জল বাহির হইল।

আনন্দরাম তাহার প্রত্যাবর্ত্তন ও পলায়ন এবং লক্ষ্মীদের মুক্তির কথা বলিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, "বহিন্, তোমরা এভাবে কোথায় যাচ্ছ?"

তখন স্মিত-বদনে মাথার বুরখা খুলিয়া ফেলিয়া নূর বাঈ বলিল, "ভাই সাহেব, যে ভুল করেছি, তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছি।"

আনন্দরাম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নূর বাঈ বলিতে লাগিল, "ভাই, যতদিন দিল্লীতে ছিলাম, ততদিন স্বপ্নের ঘোরে মুগ্ধ ছিলাম। আজ খোদার মেহেরবাণীতে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছে। কে আমি? আমার জন্য শত শত লোকের জীবন কেন যাবে? আমি কসবী। কসবী কন্যা। অর্থলোভে আমার কসবী মা আমাকে আর এক কসবীর কাছে বিক্রয় করেছিল। যে কসবী আমাকে কিনেছিল, সে আমার রূপ বিক্রয় করে অর্থ উপার্জ্জন করবার জন্য অর্থব্যয় করেছিল। আমার জন্য কাঁদবার কেহ নাই। ইরাণের বাদশাহ আমাকে ইরাণে ধরে নিয়ে গেলে হিন্দুস্থানে কেহ আমার সম্মান করবে না। অথচ আমার রূপের মোহে ভুলে আমার জন্য শাহান শাহ কত লোকের প্রাণদণ্ড করেছেন। ইরাণী সিপাহী কত শত শত সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলস্ত্রী ধরে নিয়ে যাচ্ছে! সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান সাবিত্রী-স্বরূপা কুল ললনার ধর্ম্ম ও জীবন কি কসবীর জীবন অপেক্ষা হীন? সেই শান্ত গুর্জ্জর গ্রামপ্রান্তে বসে যখন শুনতে পেলাম, ভাই আমার, যে আমার জন্য তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্ত, তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না। তাই গোলাপী বহিনের কাছে ছুটি নিয়ে সাহেবজাদাকে সঙ্গে করে তোমাকে মুক্ত করতে দিল্লী চলেছি।"

এই কথা শুনিয়া আনন্দরাম বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল। তারপর নূর বাঈয়ের হাত দুটি ধরিয়া বলিল, "বহিন, বহিন, এই দেখ, আমি মুক্ত। এই দেখ লক্ষ্মী, পদ্মিনী সকলকে মুক্ত করেছি। তোমাকে আর দিল্লী যেতে হ'বে না। ফিরে চল।"

আনন্দরামকে নিজের পাশে বসাইয়া বুরখার কোণ দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া নূর বাঈ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না ভাই, আমি আর ফিরে যাব না। খোদার অসীম কৃপায় তোমরা মুক্ত হয়েছ। তোমরা যে যার নিজের দেশে ফিরে যাও। তোমাদের সাহেব-জাদাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি বুঝছি দিল্লী অতি নিকট। কারণ, ঐ দূরে শাহজাহান বাদশাহের জুম্মা মসজেদের মিনার দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে আমি একাই যেতে পারব।"

আনন্দরাম তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইল। কিন্তু নূর বাঈ বুঝিতে চাহিল না। সে শুনিয়াছিল যে নাদির শাহ অনেক ইরাণী সিপাহীর প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। সে কাহাকেও সঙ্গে লইতে চাহিল না। কোন মতেই যখন নূর বাঈ বুঝিল না, তখন আনন্দরাম আক্রম জমানের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল যে মদ্যপ লম্পট নবাব-পুত্রের ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

আক্রম জমান কেবল তাহার দিকে চাহিয়া হাসিলেন। কোন কথা কহিলেন না।

মুখ দেখিয়া আনন্দরাম বুঝিল যে, মৃত সুজাউদ্দীন খাঁর পুত্রের মনুষ্যত্ব ফিরিয়া আসিয়াছে। পদ্মিনী ও তাহার পিতামহীকে নূর বাঈয়ের নিকট রাখিয়া আনন্দরাম আক্রম জমানকে দূরে ডাকিয়া লইয়া গেল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে পরামর্শ করিল।

সূর্য্যের তাপ কমিয়া আসিলে মলিন-বসনা নূর বাঈ একাকিনী দিল্লী যাত্রা করিল। তাহার সম্মুখে আনন্দরাম অন্য সকলকে অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া মথুরার পথ ধরিলেন। নূর বাঈ দৃষ্টির অন্তরাল হইবামাত্র সকলেই ঘোড়া ফিরাইল।

তারপর দূরে থাকিয়া সকলে নূর বাঈয়ের অনুসরণ করিল।

সহসা রাজপথে একটা ধূলার স্তম্ভ দেখা গেল।

একদল অশ্বারোহী আসিয়া নূর বাঈকে বেষ্টন করিল। দূর হইতে তাহা দেখিয়া আনন্দরাম তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া উত্তর-পশ্চিমে চলিয়া গেল। যখন তাহারা পাহাড়গঞ্জে পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নূর বাঈয়ের সম্মান

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘন হইয়া আসিয়াছে, ইরাণীর ভয়ে দিল্লীর সহরতলীতে ঘরে ঘরে প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, তখন নূতন সহরের দিল্লী ফটকে একটা তুমুল কলরব উঠিল। যে দুই একজন হতভাগ্য পথিক আশ্রয়ের অভাবে অথবা বিশেষ প্রয়োজনে তখনও পথে বেড়াইতেছিল, তাহারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, ফটকের পাহারার সিপাহী উন্মত্ত হইয়া "নূর বাঈ, নূর বাঈ" বলিয়া চিৎকার করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে অঞ্চলের অনেক মহল্লার অন্ধকার গৃহে দীপ জ্বলিয়া উঠিল। প্রত্যেক মহল্লা হইতে দুই দশ জন লোক মশাল হাতে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। এখন দিল্লীর কেল্লার দক্ষিণ দিকে কেবল ইংরাজী আমলের ঘর বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বে এই দিকে সোনেরী মস্‌জেদ হইতে সহরে দিল্লী ফটক পর্য্যন্ত ঘন বসতি ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের বিখ্যাত পরাক্রান্ত ওমরাহরা এই মহল্লায় গৃহনির্ম্মাণ করিতেন। বাদশাহ শাহজাহানের বিখ্যাত উজীর সাদুল্লা খাঁ, ইতিহাস বিশ্রুত পারস্যদেশীয় বিশ্বাসঘাতক আলীমর্দ্দন খাঁ, আওরঙ্গজেব বাদশাহের উজীর আসদ খাঁ প্রভৃতির প্রাসাদ এই মহল্লায় ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের পরে ইংরেজ এই সমস্ত পুরাতন প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পল্টনের অফিসারদের বাংলা ও সিপাহীদের 'লাইন' তৈয়ারী করিয়াছেন।

অবস্থা অনুসারে কেহ বা ঘোড়ায়, অপরে পায়ে হাঁটিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল। যাহাদের ক্ষমতা ছিল তাহারাও ইরাণীর ভয়ে তঞ্জাম বা পাল্কী চড়িতে ভরসা করিল না। উচ্ছৃঙ্খল দিল্লীবাসীর নয়নের মণি নূর বাঈ ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া কেহ কেহ সাজিতে বসিয়া গেল। সুতরাং তাহাদের পথে বাহির হইতে বিলম্ব হইল। ক্রমে ক্রমে রাজপথে অসম্ভব ভিড় হইল। ইরাণী সওয়াররা মারিয়াও লোক সরাইতে পারিল না। নূর বাঈ একখানা রথে চড়িয়া আসিতেছিল। রথের মধ্যে সে নিশ্চল প্রতিমার মত বসিয়া ছিল। সহস্র সহস্র মশালের উজ্জ্বল আলোকে তাহার শুভ্র মর্ম্মর বিনিন্দিত বর্ণও মলিন ধূলি-ধূসরিত পরিচ্ছদ অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। দিল্লীর উচ্ছৃঙ্খল যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে প্রেম সম্ভাষণ করিতেছিল, কেহ বা ফুল অথবা আতরে ভিজান তূলা ছুড়িয়া মারিতেছিল।

নূর বাঈ পূর্ব্বে যখন রূপার তঞ্জামে চড়িয়া দিল্লীর রাজপথে বাহির হইত, তখন সে হাসিমুখে শত সহস্র নায়কের প্রেম-সম্ভাষণ বা অভিবাদন গ্রহণ করিত এবং যথাযোগ্য উত্তর দিত। ফুল অথবা আতর পাইলে সেলাম করিত। কিন্তু আজ সে শত শত হিন্দু ও মুসলমান যুবার সম্ভাষণ নীরবে প্রত্যাখ্যান করিতেছে দেখিয়া সকলের মনে ধীরে ধীরে আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। একজন বলিয়া উঠিল যে, হয়ত নূর বাঈয়ের কোতল হইবে। কথাটা বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পড়িল। দুই চারিজন প্রেমিক তখনই 'হায় হায়' করিতে করিতে বুক চাপড়াইয়া, পোষাক ছিঁড়িয়া পথের

ধুলা মাথায় দিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের ছুই চারি জন শোকের তৃষ্ণায় আকুল হইয়া মদের দোকানের পিছনের দরজা দিয়া মদের পিপায় আশ্রয় লইল। এখন যেখানে জুম্মা মসজেদের প্রধান প্রবেশ-দ্বার, তাহারই সম্মুখে বাদশাহী প্রাসাদে লাহোর ফটকের অনতিদূরে রিসালা দাঁড়াইল। একজন সওয়ার বাদশাহ মহম্মদ শাহ এবং তাহার বাদশাহ নাদির শাহকে সংবাদ দিতে গেল।

তখন দৈনিক মজলীস বসিয়াছে। নূর বাঈ প্রাসাদের নিকটে আসিবার বহু পূর্ব্বে তাহার আগমন সংবাদ উভয় বাদশাহের নিকট পৌঁছিয়াছে। কিন্তু কথাটা সকলে বিশ্বাস করে নাই। কেহ বলিল এ আবার বাঙ্গালী জিনের যাতু। কেহ বলিল যে নূর বাঈ আর কাহাকেও পাঠাইয়া দিয়াছে। অনেকেই বিশ্বাস করিল না যে নূর বাঈ ইচ্ছা করিয়া সিংহের বিবরে প্রবেশ করিয়াছে। ইরাণী নসকচী কুর্নিশ করিয়া এত্তালা দিল। মজলীসের গান বাজনা থামিয়া গেল। শাহান শাহের হুকুমে নসকচী অভিযান করিয়া নূর বাঈকে আনিতে গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পরের মজলীস যমুনাতীরে রঙ্গমহলে বসিয়াছিল। সহস্র আলোক-দীপ্ত শাহজাহানের শুভ্র মর্ম্মর-নির্ম্মিত অমরাপুরীতে কেতকী শুভ্রবর্ণা মলিন-বসনা নূর বাঈ যখন আসিয়া দাঁড়াইল, তখন অনেকেই তাহাকে চিনিতে পারিল না। যে নূর বাঈ একদিন কোটি সুবর্ণের অধিশ্বরী ছিল, মণি-মরকতে আবৃতা হইয়া যে দরবারে পদার্পণ করিত, বারাণসী ও আহমদাবাদের কিংখাব ব্যতীত যাহার পেশোয়াজ তৈয়ারী হইত

না, সুদূর জাহাঙ্গীর নগরে ঢাকার বহুমূল্য মসলীনে মুক্তার দানা বসাইয়া যাহার ওড়না প্রস্তুত হইত, সে আজ দরিদ্রা, গুর্জ্জর রমণীর মলিন ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছে, একথা বিশ্বাস করিতে অনেকেরই বিলম্ব হইল।

নূর বাঈ তস্‌লীম করিল। শাহান শাহ নাদির শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

উত্তর হইল, "শাহান শাহ, আমি সরকারের বাঁদী—সহরের তওয়াইফ্, আমার নাম নূর বাঈ।"

"তুমি যে নূর বাঈ, তার প্রমাণ?"

"শাহান শাহ, আমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। আমার পয়সার সঙ্গে সব গিয়েছে। যায় নি কেবল আমার গলার আওয়াজ।"

সেই মধুর নিক্কণ, মজ্‌লীসের সব লোক স্তব্ধ হইয়া সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতেছিল। যে কণ্ঠের ধ্বনিতে শাহ জাহানের প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষ একদিন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কানের পথে প্রবেশ করিয়া সকলের মনের সন্দেহ দূর করিয়া দিল। বাদশাহ মহম্মদ শাহ স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইয়া নাদির শাহকে কুর্নিশ করিয়া বললেন,—"শাহান শাহ, এ নিশ্চয়ই নূর বাঈ।"

নাদির শাহ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "প্রমাণ?"

বৃদ্ধ চীন কিলিচ খাঁ নিজাম-উল-মুল্ক অস্ফুট স্বরে নাদির শাহকে কি বলিলেন। নস্‌কচী নূর বাঈকে অন্যত্র লইয়া গেল।

হমামে বাঁদীরা আসিয়া তাহাকে স্নান করাইল। মৃত বাদশাহ মালিকা-উজ-জমানী বেগমের পোষাক ও অলঙ্কার

আনিল। নূর বাঈ স্নান করিয়া পোষাক পরিল কিন্তু অলঙ্কার প্রত্যাখ্যান করিল। একগাছি শুভ্র পুষ্পের মালা গলায় দিয়া নূর বাঈ যখন মজলীসে পদার্পণ করিল, তখন সহস্র নর্ত্তকী ও বাদক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। আজ সে একাকিনী। তাহার সঙ্গে ওস্তাদ নাই। বাদক নাই। পানবরদার নাই। বাঁদী নাই। কিন্তু সেই মজলীসে উপস্থিত দুই শতের উপর ওস্তাদ শাহান শাহ নাদির শাহকে তস্‌লীম করিয়া নূর বাঈয়ের সেবা করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল।

তখন নূর বাঈয়ের চোখে জল আসিল। এতদিন দিল্লীতে বাস করিয়া, এতকাল বাদশাহের দরবারে মুজ্‌রা করিয়া এত বড় সম্মান সে কোন দিন পায় নাই।

ওস্তাদদের ভিতর হইতে সে চারিজনকে বাছিয়া লইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুইজনকে দিল্লীর কোন ওস্তাদ চিনিতে পারিল না।

মুজরা আরম্ভ হইল। যে কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠে সে মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, যাহার মোহিনী শক্তিতে বাদশাহ মহম্মদ শাহ আজ বন্দী, তাহা আবার নিজ মোহিনী-মদিরা ছুটাইয়া বর্ব্বর ইরাণী ও শিক্ষিত মোগল উভয়কেই দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল।

একটা গান শেষ হইল। নূর বাঈ আজ বড় মধুর গাহিল। শাহান শাহ নাদির শাহ মুগ্ধ হইলেন। সুবর্ণ পাত্রে পরিপূর্ণ আরক শাহান শাহ নাদির শাহের আদেশে রত্ন-খচিত পাত্রে করিয়া বাদশাহ মহম্মদ শাহ স্বয়ং নূর বাঈয়ের সম্মুখে ধরিলেন।

তীব্র মদিরা পানে নূর বাঈয়ের রক্তহীন গণ্ডে রক্তিম আভা আবার দেখা দিল। সুবর্ণের থালে থালে ফল ও মোরব্বা আসিল। নূর বাঈ দুই একটি মুখে দিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

এইবার নাচ আরম্ভ হইল। গানের পর গান, নাচের পর নাচ। স্তব্ধ হইয়া ইরাণী ও মোগল, হিন্দু ও মুসলমান সভাসদগণ সেই অপরূপ অঙ্গভঙ্গী ও অপ্সরী বিনিন্দিত কণ্ঠে সঙ্গীত সুধা মুগ্ধ হইয়া দেখিল ও শুনিল। অদূরে নকরাখানায় বিশ্ববিশ্রুত বাদশাহীর রওশন চৌকীর অপূর্ব্ব বাদ্য আজ আর কেহ শুনিল না।

প্রথম প্রহর, দ্বিতীয় প্রহর, তৃতীয় প্রহরও কাটিয়া চতুর্থ প্রহরে যখন শুভ্র মর্ম্মর রাশির উপরে উষার শুভ্র আলোক শুভ্রতর হইয়া উঠিল, তখন শাহান শাহ নাদির শাহ বুঝিতে পারিলেন যে, রাত্রি শেষ হইয়াছে।

পরিশ্রান্ত নূর বাঈকে বসিতে আদেশ করিয়া নাদির শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূর বাঈ এত মান, এত সম্ভ্রম, এত ধন-দৌলত ছেড়ে তুমি পালিয়েছিলে কেন?"

নূর বাঈ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তস্‌লীম করিয়া বলিল, "শাহান শাহ, ভয়ে।"

"কিসের ভয়, নূর বাঈ?"

"শাহান শাহ, আমার জন্য কাঁদবার কেউ নেই। প্রাণের ভয়ও আমার নেই।"

"তবে পালিয়েছিলে কেন?"

"প্রাণের ভয়ে নয়, শাহান শাহ, হিন্দুস্থান ছেড়ে ইরাণে যাবার ভয়ে।"

"ইরাণ কি এত খারাপ, নূর বাঈ ?"

"বুলন্দপনা, যা চোখে দেখেনি, তা বলতে পারি না। কিন্তু আমার হিন্দুস্থানের সব মিঠা—জল মিঠা, হাওয়া মিঠা, ফুল মিঠা, ফল মিঠা, হয়ত এর চাইতেও মিঠা দেশ আছে, জাহাপনা। কিন্তু সে মিঠা আমি চাই না। আমি যে দেশে জন্মেছি, সেই দেশই আমার মিঠা। আমার কাছে এমন মিঠা আর কিছুই লাগবে না।"

"কি মনে করে ফিরে এসেছ, নূর বাঈ ?"

"জাহাপনা সাজা দেবেন।"

"কি সাজা আশা করে এসেছ ?"

"কোতল ও গর্দ্দান।"

"সমস্ত মাফ্‌, নূর বাঈ। তুমি কস্‌বী হলেও আল্লার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। জানোয়ার ভিন্ন তোমার অঙ্গে কেউ হাত দেবে না।"

"সমস্ত মাফ্‌ ?"

"সকল লোক ধন-দৌলত সমেত মাফ্‌।"

উত্তর শুনিয়া নূর বাঈ সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পদ্মিনীর প্রেম

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া পদ্মিনী তখনও পাহাড়গঞ্জের ছোট দোতালা বাড়ীটির বারান্দায় বসিয়াছিল। লক্ষ্মী অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার পিতামহী সমস্ত রাত্রি ঢুলিয়া শেষ রাত্রিতে তাহারই পাশে শয়ন করিয়াছেন। যাহারা তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাহারা বিছানা পত্র পাতিয়া দিয়া মধ্য রাত্রিতে বিদায় লইয়া গিয়াছিল। এখন তাহারা আসিয়া দেখিল যে যেমনকার বিছানা তেমনই পড়িয়া আছে। তাহাদের অতিথিরা বারান্দায়। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর দক্ষিণদিকের সহরতলীতে একটা আনন্দের রোল উঠিল। পাহাড়গঞ্জ, জয়সিংহপুরা ও পাঁচকুয়া অঞ্চলে সকলেই সানন্দে বলিতে আরম্ভ করিল যে,—শাহন শাহ নাদির শাহ নূর বাঈয়ের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হইয়া কেবল তাহাকে মাফ করেন নাই, তাহার ও আনন্দরামের পলায়নে যেঁ যে লিপ্ত ছিল, সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন।” সংবাদ শুনিয়া পদ্মিনীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার পিতামহী উঠিয়া বসিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য এবং গরু কয়টির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। লক্ষ্মী জাগিয়া উঠিয়া সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল,—“বাবুজী কখন আসিবে?”

বেলা বাড়িয়া উঠিলে খেরুয়ার খোলে বাঁধা সারেঙ্গী স্কন্ধে

ফেলিয়া দুইজন বয়স্ক মুসলমান সহরের আজমীর ফটক দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ফটকের পাহারা তাহাদিগকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। মাঠে একটা বড় ইন্দারার পার্শ্বে বসিয়া কাপড় ছাড়িয়া মুখের দাড়ি গোঁফ ছিঁড়িয়া, রং ধুইয়া ফেলিয়া তাহাদের মধ্যে একজন হিন্দু আনন্দরাম ও অপর মুসলমান আক্রম জমান খাঁ হইয়া দাঁড়াইল। পরচুলা ও ছাড়া কাপড় সারেঙ্গীর গেলাপের মধ্যে পুরিয়া তাহারা যখন পদ্মিনীদের বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মহল্লার লোক চারিদিক হইতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। নূর বাঈয়ের অপূর্ব্ব নৃত্যগীত, শাহান শাহের সন্তোষ এবং সকলের মুক্তির সংবাদ জানাইয়া অনেক কষ্টে তাহাদের হাত এড়াইয়া আনন্দরাম যখন বাড়ীতে ঢুকিতে গেল, তখন সে দেখিল যে অবগুণ্ঠনমুক্তা পদ্মিনী লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া তাহার জন্য নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পদ্মিনীকে দেখিয়া হঠাৎ লজ্জায় আনন্দরামের মুখ ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু লক্ষ্মী তাহাকে কথা কহিতে দিল না। সে আনন্দরামকে উপরে যাইতে বলিল। উপরে গেলে লক্ষ্মীর পিতামহী তাহাকে গৃহস্থালী ও গরু কয়টির জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিল। বারান্দার পাশের ঘরে আক্রম জমান খাঁ তখন আলবোলায় মুখ দিয়াছেন। গৃহে ফেরা তখনও অসম্ভব এবং বিকালে সে গরু কয়টির সংবাদ লইয়া আসিবে বলিয়া বৃদ্ধাকে নিরস্ত করিয়া আনন্দরাম লক্ষ্মীকে লইয়া আক্রম জমানের নিকট গেল। দেখিতে দেখিতে গৃহস্বামী ও পদ্মিনী তাহাদের জন্য সরবৎ ও ফলমূল

লইয়া আসিল। আক্রম জমান তখন ঘুমের ঘোরে অভিভূত। সরবৎ পাইয়া আলবোলা ছাড়িয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া আনন্দরাম যত শীঘ্র সম্ভব আহার শেষ করিয়া শুইয়া পড়িল।

তৃতীয় প্রহর বেলায় যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন আনন্দরাম আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে পদ্মিনী তাহার শিয়রে বসিয়া একটি ছোট চামর লইয়া তাহার মুখের মাছি উড়াইতেছে।

পদ্মিনীকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। তাহার ভাব দেখিয়া ঘরের মধ্যে আর একজন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে লক্ষ্মী। সে আর একটি ছোট চামর লইয়া আক্রম জমানের কাছে বসিয়াছিল।

আনন্দরাম উঠিয়া বসিলে পদ্মিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী, এইবারে ত আমরা বাড়ী যাব! তোমার চাকরদের আর গোলাপী দিদিকে আনতে পাঠাও না!"

পদ্মিনী একাকিনী তাহার কাছে আসিয়াছে মনে করিয়া আনন্দরাম অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার লজ্জার ভাবটা এখনও কাটে নাই। সে হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু পদ্মিনী কিছুমাত্র লজ্জিত হয় নাই।

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবুজী, আমাদের বাড়ী ফিরতে কত দেরী হবে?"

আনন্দরাম সাহসে ভর করিয়া এইবার একটা উত্তর দিয়া ফেলিল। সে বলিল, "ইরাণীরা যতদিন এ অঞ্চলে আছে, ততদিন অভিভাবকহীনা স্ত্রীলোকের পক্ষে দিল্লীতে বাস করা অসম্ভব।"

বিস্ময়-বিস্ফোরিত নেত্রে পদ্মিনী বলিল,—"কেন বাবুজী? দাদী বলেছে—আমরা আর তোমাকে ছেড়ে থাকব না।"

আবার বিষম লজ্জা আসিয়া আনন্দরামকে অভিভূত করিল। তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পদ্মিনী কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাহার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুজী, খাঁ সাহেব মুসলমান বলে কি আমাদের বাড়ীতে থাকবেন না? গোলাপী দিদি ত হিন্দু।"

গোলাপী কোথায় যাইবে, আক্রম জমান কোথায় থাকিবেন, এ প্রশ্ন এতদিন আনন্দরামের মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু সে যেদিন পদ্মিনীকে প্রথম স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহার নব-যৌবনোদ্ভাসিত অনিন্দ্যসুন্দর দেহ আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ঘোড়ায় উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই দিন হইতে আনন্দরাম তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। স্বভাবতঃ আশ্রিতরক্ষকের প্রতি পদ্মিনী অতিশয় অনুরক্তা হইয়াছিল। কিন্তু আনন্দরামের মনে ভাবে ও প্রতিভাবে যে বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, পদ্মিনী সে কথা একেবারেই ভাবে নাই। সে মনে করিয়াছিল যে তাহারা আবার তাহাদের গৃহে ফিরিয়া যাইবে। ইরাণীরা দেশে ফিরিয়া যাইবে। দিল্লীতে আবার পূর্ব্বের মত সুখশান্তি ফিরিয়া আসিবে। বাবুজী যেমন তাহাদের বাড়ীতে থাকিত, চিরদিনই তেমন ভাবে থাকিবে।

আনন্দরাম ভাবিত যে সে বাঙ্গালী কায়স্থ। দেশে তাহার আত্মীয় স্বজন আছে। সমাজ আছে। ধর্ম্ম আছে। পদ্মিনী

পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়াণী। তাহার উপর সে বাল বিধবা। পদ্মিনীকে সে কিছুতেই হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ করিতে পারিবে না। এবং অন্যমতে বিবাহ করিলে বাঙ্গলা দেশে ফিরিয়া গিয়া সে সমাজে বাস করিতে পারিবে না। অথচ সরলা রূপসী প্রেমময়ী পদ্মিনী তাহাকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে যে তাহাকে পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। পদ্মিনী এখন আবার তাহার মনে একটা নূতন কথার উদয় করাইয়া দিল। বাঙ্গলা দেশে সুজাউদ্দীন খাঁ মৃত। অপরিণত বয়স্ক সরফরাজ খাঁ নবাব। মহম্মদ শাহের এমন শক্তি নাই যে তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের এক জন শাসনকর্তার পরিবর্তে আর একজন নিযুক্ত করেন। বাঙ্গলা দেশে ফিরিলে আক্রম জমানের মৃত্যু নিশ্চিত। আর গোলাপী। হতভাগিনী বালবিধবা, যৌবনে দ্বিচারিণী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কন্যা। সে কোথায় যাইবে ?

আনন্দরামকে অন্যমনস্ক দেখিয়া পদ্মিনী বলিল, "বাবুজী, তোমার জন্য বাঙ্গলা খয়ের দিয়ে পান সেজে আনি।"

পদ্মিনীর কথার আওয়াজে আনন্দরামের চমক ভাঙ্গিল। তাহার মন হইতে আক্রম জমান ও গোলাপীর কথা দূর হইয়া পদ্মিনী তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিল। তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বেগে শোণিত প্রবাহিত হইল। সহসা আনন্দরাম পদ্মিনীময় হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই পদ্মিনী ফিরিয়া আসিল। অদমনীয় আকাঙ্ক্ষা, এত দিনের প্রবল তৃষ্ণা আনন্দরামকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

সে এমন ভাবে পদ্মিনীর মুখের দিকে চাহিল যে সে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া রক্তবর্ণা হইয়া উঠিল। তাহার হাতের পানের ডিবা পড়িয়া গেল। কিন্তু পদ্মিনী পলাইল না। সে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া আনন্দরামের পাশে বসিয়া পান তুলিতে লাগিল। তখন তাহার শুভ্র সুন্দর মুখে পদ্মরাগের লীলা। আনন্দরাম তাহাই একমনে দেখিতে দেখিতে তাহার একখানি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল। লজ্জায় অবনত হইয়া পদ্মিনী মুখ ফিরাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী হাসিয়া উঠিল। সে হাসির শব্দে আনন্দরামের চমক ভাঙ্গিল। সেও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া বসিল। নিজের মনের অবস্থা গোপন করিবার জন্য আনন্দরাম ভাণ করিয়া লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল, "লক্ষ্মী তুই হাসলি কেন? খাঁ সাহেবের যে ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

লক্ষ্মী আবার হাসিয়া উত্তর দিল, "দিদি যে কেমন কচ্ছে, বাবুজী।"

তাহার কথা শুনিয়া পদ্মিনী আরও জড়সড় হইয়া গেল। লক্ষ্মী আবার হাসিয়া উঠিল। সকল দিক সামলাইবার জন্য আনন্দরাম পদ্মিনীকে বলিল, "কৈ পান এনেছ?"

সর্ব্বাঙ্গের বস্ত্র টানিয়া, মাথার কাপড় আরও টানিয়া দিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া পদ্মিনী বলিল, "এই যে এনেছি। পড়ে গিয়েছিল বলে তুলছি।"

এই সময় আক্রম জমানের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

পদ্মিনী আনন্দরামের পায়ের কাছে পান ফেলিয়া ছুটিয়া

পলাইল। লক্ষ্মী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। খাঁ সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি, বাবুজী?"

বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া আনন্দরাম বলিল, "এখন কি উপায়, সাহেবজাদা। আপনিই বা কি করবেন, আর আমিই বা কোথায় যাই? বাঙ্গলা দেশ এখন আপনার শত্রুপুরী। আমাদের বাঙ্গালী বিশ্বাসঘাতকগুলি সবাই আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।"

আক্রম জমানের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বাবুজী, যতদিন মদের নেশায় অচেতন হয়ে থাকতাম, ততদিন আমার ভাববার ক্ষমতা ছিল না। বহিন নূর বাঈ আমাকে মানুষ করেছে। যত দিন থেকে মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়েছি, ততদিন ধরে ভাবছি। আজ ভবিষ্যতের পথ স্থির করেছি।"

সাগ্রহে আনন্দরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি স্থির করেছেন?"

"স্থির করেছি যে এই দেশেই থাকব। বাঙ্গলা দেশে আর ফিরব না।"

"আর সাহেবজাদা?"

"গোলাপীর কথা জিজ্ঞাসা করছো বাবুজী? তার জন্ম ভেবো না। আমি জানি যে তুমি তাকে বড় বহিনের মত ভালবাসো। আমি গোলাপীকে নিকা করবো। তাকে কুলত্যাগ করে আনিয়েছি বটে, কিন্তু এখন থেকে সে কুলবধূ।"

কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া আনন্দরাম সাহেবজাদা আক্রম জমান খাঁর সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া তাহার দুইটি হাত

ধরিল। আক্রম জমান তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আজ থেকে এ সম্মান আর আমাকে তুমি দেখিও না বাবুজী। তুমি বার বার আমার জীবন রক্ষা করেছো। আমাকে যদি মেহেরবাণী করে ভাই বল, তা হ'লেই আমি চিরকৃতার্থ হব। তুমি দেশে ফিরে যাও। আল্লা তোমার উন্নতি করবেন।"

আলিঙ্গন ছাড়াইয়া শুষ্কমুখে আনন্দরাম বলিল, "বাঙ্গলা দেশে আমারও স্থান নেই সাহেবজাদা।"

আক্রম জমান হাসিয়া বলিলেন, "তা অনেক দিন ধরেই বুঝেছি।"

আনন্দরাম আবার লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন আক্রম জমান বলিলেন, "ভাই সাহেব! একবার নূর বাঈয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আর একবার হজরৎ-ই-আলা দীন পনাহ্ ফকীর লুৎফ উল্লা শাহ সাহেবের দর্শন চাই। বাবুজী আমি গোলাপীর মুখে সমস্তই শুনেছি।"

আনন্দরাম একটি কাজ পাইয়া বাঁচিল। সে বলিল, "চলুন. এখনই যাই, তবে পোষাকটা বদলাতে হবে।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নাদির শাহের প্রত্যাবর্ত্তন

মোগল বাদশাহের রাজধানী দিল্লী শোষণ শেষ করিয়া শাহান শাহ নাদির শাহ নিজের দেশে ফিরিলেন। তুর্কমান, তাতার, উজবেগ, কিজিলবাস ও মোগল আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিল্লীবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মুখ শুকাইয়াছে। ধনরত্ন যাহার যাহা ছিল, এতদিন ধরিয়া বিজেতা ইরাণী সমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছে। অনেক ঘর হইতে সুন্দরী কন্যা ও বধূ সরিয়া গিয়াছে। বাকি আছে কেবল কতকগুলি জীবন এবং কয়েকজনের মানসম্ভ্রম। সকল শ্রেণীর সকল জাতির দিল্লীবাসী আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকের দুয়ার বন্ধ। শাহান শাহের সহী-মোহরযুক্ত ছাড়পত্র বা দস্তক না দেখাইলে দিল্লী নগর হইতে কাহারও বাহিরে যাইবার উপায় নাই। যাহারা নগর প্রাচীরের বাহিরে আছে, তাহারাই কেবল নিরাপদ। সহরের ভিতরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। জাঠরা চারিদিকে লুঠ করিয়া বেড়াইতেছে। খাদ্যসামগ্রী বাহির হইতে দিল্লীর ভিতরে কিছুই আসিতেছে না। অথচ স্ত্রীপুত্র লইয়া দিল্লীর বাহিরে যাইবারও উপায় নাই। বাজারে, মহল্লায় মহল্লায় নানারকম গুজব উঠিতেছে। একদিন শুনা গেল যে দশ হইতে চল্লিশ বৎসর বয়সের সমস্ত স্ত্রীলোক ও আট হইতে পনেরো বৎসর বয়সের সমস্ত বালক ধরিয়া লইয়া যাইবার হুকুম হইয়াছে। সেইদিন হিন্দু ও মুসলমান অনেক সম্ভ্রান্ত

রমণী আত্মহত্যা করিল। যাহাদের মনের বল ছিল, তাহারা স্ত্রীকন্যাকে বিষ দিয়া অথবা অন্য উপায়ে হত্যা করিল। আর সকলে কাঁদিয়া ভাসাইল।

দিল্লী সহরের ফটকে ফটকে কড়া পাহারা। সমস্ত হিন্দুস্থানী সৈন্য সরাইয়া দিয়া কেবল ইরাণী সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া দিল্লীবাসীর ভয় আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় দুইজন সম্ভ্রান্ত ইরাণী বণিক অন্ধকারময় চাঁদনা চৌকের বিস্তৃত রাজপথ ছাড়াইয়া একটি সঙ্কীর্ণ গলিতে প্রবেশ করিল। চাঁদনী চৌক নাদির শাহের দিল্লী-প্রবেশের পর হইতেই অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। দিনের বেলা কেবল ফল ও সব্জীর দোকান খোলা থাকে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। কেবল রুটিওয়ালা, কাবাব-ওয়ালা ও শুঁড়ী সমস্ত রাত্রি কারবার চালাইয়া থাকে। চাঁদনী চৌকের বিখ্যাত বাজার অনেক দিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণ জহরাৎ, শাল-রুমাল, রেশম, কিংখাপ, হস্তিদন্ত ও চিত্রবিক্রেতারা অনেক দিন দোকান বন্ধ করিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গুণ্ডা ও ইরাণী সৈন্য মাতাল হইয়া চিৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। দুইজন ইরাণী বনিককে কেহ কিছু বলিল না। কারণ তাহারা ইরাণী। দুই একজন ইরাণী সৈন্য তাহাদের যে ভাষায় দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহারাও সেই ভাষায় উত্তর দিল। অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গলিতে প্রবেশ করিয়া তাহারা একটি ছোট বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। কবাটে ঘা দিবামাত্র ভিতর হইতে একজন পরিষ্কার বাঙ্গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "কে? কি চাই?"

তখন একজন ইরাণী বণিক পরিষ্কার বাঙ্গলা ভাষায় বলিয়া উঠিল, "সদানন্দ ও বনমালী।"

দুয়ার খুলিয়া গেল। বনমালী বাহির হইয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "হুজুর, খবর ভাল ত ?"

ইরাণী বণিকবেশী আনন্দরাম বলিল, "এ পর্য্যন্ত সমস্তই ভাল। গরুগুলা কেমন আছে ?"

"হুজুরের কৃপায় সমস্তই মঙ্গল। গুণ্ডারা দু' একদিন লুঠতে এসেছিল। কিন্তু পাড়ার লোক তাদের মেরে হাঁকিয়ে দিয়েছে।"

"ফকির সাহেবের খবর কি ?"

"তিনি একটু ফুলেছেন।"

গলির মোড়ে পদশব্দ শুনিয়া সকলে বাড়ীর ভিতর গেলেন। উঠানের একটা প্রকাণ্ড উনানের উপর লোহার কড়ায় দুধ জ্বাল দিয়া সদানন্দ রাবড়ী তৈয়ার করিতেছিল। সে উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিল। আনন্দরাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সদাই, কত দুধ হচ্ছে ?"

সদানন্দ একগাল হাসিয়া বলিল, "হুজুর, এ যেন নিতুই মচ্ছব লেগেছে। এতগুলা গরু, রোজ দেড় মন দু' মন দুধ হচ্ছে। বিলিয়ে উঠতে পারা যায় না। ফকির সাহেবের জন্য পাঁচ সাত সের দুধ রাখি, আর সমস্ত দিন বিলুই।"

"এত গরুর খোরাক যোগালে কি করে ?"

"সে হুজুরের কৃপা আর শ্রী গৌরাঙ্গের লীলা। সকাল থেকে যে দুধ নিতে আসে, তাদের কেউ শুধু হাতে আসে না। কেউ

ভূষি, কেউ খড়, কেউ বা ঘাস হাতে করে আসে। দশ দিন ধরে ঝাঁকা ঝাঁকা বাবলার ফল খেয়ে গরুগুলো ফুলে উঠেছে হুজুর।"

ফকির সাহেবের খবর কি ?"

"এই মাত্র ছিটের আগুন দিতে গিয়ে, রাবড়ীর ভাড়ে আগুন দিয়েছিলেন বলে একটু মেজাজটা আগুন হয়েছে।"

আনন্দরাম ও তাহার সঙ্গী একটা কামরায় ঢুকিয়া পোষাক ছাড়িল। ইরাণী বণিকের পরিবর্ত্তে বাবু আনন্দরাম রায় ও সাহেবজাদা আক্রম জমান খাঁ সাজিয়া বাহিরে আসিল। যে ঘরে লুৎফ উল্লা থাকিত, সেই ঘর হইতে তখনও পোড়া দুধের গন্ধ বাহির হইতেছিল। আনন্দরাম ঘরের ভিতর গিয়া দেখিল যে লুৎফ উল্লা রাবড়ীর ভাড় হইতে জিহ্বা দিয়া ছাই ও ভাঙ্গা টিকার গুড়া টানিয়া বাহির করিতেছে। ঘরের কোণ হইতে একটি ছেড়া ময়লা মাদুর টানিয়া আনিয়া আনন্দরাম সাহেবজাদাকে বসিতে দিল।

সে দেখিল যে, এই কয় মাস ধরিয়া অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে লচ্ছেদার রাবড়ী ভোগ করিয়া কৃশকায় লুৎফ উল্লা হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার গাত্রে ও বস্ত্রে বিষম দুর্গন্ধ। সে এই কয় মাস জলস্পর্শ করে নাই। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছে বলিয়াও বোধ হইল না। আনন্দরাম একটা আতরের শিশি বাহির করিয়া আক্রম জমান খাঁর হাতে দিল এবং নিজে মাদুরের উপর বসিল।

এতক্ষণে ফকির সাহেবের হুস হইল। তিনি চক্ষু মুদিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?"

আনন্দরাম হাসিয়া বলিল, "আমরা খোদার নসকৃচী। খোদার হুকুমে তোমাকে নরকে পাঠাতে এসেছি।"

তাহার কথা শুনিয়া লুৎফ উল্লা সভয়ে চক্ষু মেলিয়া দেখিল যে আনন্দরাম ও একজন ভদ্রবেশী মুসলমান বসিয়া আছে। তখন সাহস পাইয়া সে বলিল, "বাবুজী আদাব। খোদা তোমার তরক্কী করুণ, রাবড়ী বহুৎ বহুৎ তোফা।"

"তুমি ভুল করছো ফকীর। আমরা খোদার নসকৃচী, এই পোষাকে এসেছি।"

"কি হুকুম?"

"মেহেরবান খোদা তোমার উপর বড়ই নারাজ। আজ থেকে তোমার রাবড়ীর খোরাক বন্ধ।"

আতঙ্কে ফকির লুৎফ উল্লা চেঁচাইয়া উঠিল। সে বলিল "দোহাই খোদার, আমি অনেক গোস্তাকী করেছি, রাবড়ী বন্ধ হলে মরে যাব।"

"খোদা তোমাকে মহম্মদ শাহের বদলে হিন্দুস্থানের বাদশাহী দিয়েছিলেন?"

"আলবৎ, মহম্মদ শাহ কাফের। তার মুল্লুকে রাবড়ী পাওয়া যায় না।"

"তুমি বাদশাহ হয়ে কি করেছ?"

"ফুরসৎ পাইনি হুজুর—ফুরসৎ পাইনি হুজুর।"

"এই যে শিয়া কাফেররা এসে দিল্লীতে সৈয়দ, মৌলবী, মস্তী আর হাফেজদের উপরে অত্যাচার করেছে, তুমি তার কি প্রতিকার করেছ?"

লুৎফ উল্লা নীরব।

"কাল সকালে তোমাকে কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে হবে।"

লড়াই শুনিয়া ফকিরের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

"যদি লড়াইতে না যাও, তা হলে তোমার রাবড়ীর খোরাক বন্ধ।"

"তবে যাব।"

উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া আনন্দরাম উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আক্রম জমান ও উঠিলেন। দুইটা বড় ঝাঁকায় সদানন্দ ও বনমালাকে কাপড়ের বস্তার উপরে ঘুঁটিয়া সাজাইতে বলিয়া আনন্দরাম ও আক্রম জমান পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন। লুৎফ উল্লার বাড়ীর একটা বড় ঘরে আনন্দরাম নিজের বহুরূপী সাজ বোঝাই করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া দুইবস্তা পোষাক ও পরচুলা ঝাঁকার মাঝখানে রাখিয়া সদানন্দ ও বনমালী উপরে ঘুঁটিয়া সাজাইয়া দিল।

আনন্দরাম তখন একটা ছেঁড়া নীল রঙ্গের ঢিলা পা-জামা ও তাহার উপরে একটা সাদা মোটা কাপড়ের কোর্ত্তা পরিয়া মাথায় শতছিন্ন ধূলি ধূসর ছিটের পাগড়ী বাঁধিল। আক্রম জমানকেও সেইরূপ সাজাইয়া ঘুঁটিয়ার ঝাঁকা মাথায় লইয়া উভয়ে গলির পথে বাহির হইল।

ফিরিয়া আসিয়া নূর বাঈ ধন-দৌলত ও সম্ভ্রম সমস্তই ফিরিয়া পাইয়াছিল। পায় নাই কেবল স্বাধীনতা। শাহান-শাহ নাদির শাহের হুকুমে তাহার দুয়ারে কড়া পাহারা

বসিয়াছিল। এক প্রহর রাত্রিতে দুইজন মুটিয়া যখন ঘুঁটিয়ার ঝাঁকা লইয়া তাহার ফটকে প্রবেশ করিল, তখন ইরাণী সিপাহীরা আপত্তি করিল না। কারণ তাহাদের উপরে হুকুম ছিল যে কোন লোক আসিলে, ভিতরে আসিতে দিবে কিন্তু বাহির হইতে দিবে না।

অন্দরে নূর বাঈয়ের খোজা তাহাদিগকে আটকাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে আনন্দরাম তাহাকে একটা সাঙ্কেতিক কথা বলিয়া দিল। খোজা নূর বাঈয়ের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে প্রথমে বাবুর্চ্চিখানার উপরে বৈঠকখানায় লইয়া গেল। নূর বাঈ একাকিনী বসিয়া এসরাজ বাজাইয়া আপন মনে গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছিল। সে তাহাদের দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তসলীম করিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

নূর বাঈয়ের মজলীস

আনন্দরাম ও আক্রম জমান খাঁ বসিলে নূর বাঈ তাহাদিগকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। কারণ আনন্দরাম দুই হাতে একখানা বড় কাগজ তাহার চোখের সম্মুখে ধরিয়াছিল। তখন রাত্রি আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু সে দিন দরবারে মজলীস ছিল না। কাগজ পড়া শেষ করিয়া নূর বাঈ তাহার সমস্ত খোজা ও পরিচারককে ডাকিয়া পাঠাইল। চারিদিকে লোক ছুটিল। অন্ধকারে সোনার রং দেখিয়া দুই চারিজন কিজিলবাসও ঘোড়া ছুটাইয়া নূর বাঈয়ের হুকুম তামিল করিতে চলিল। একদণ্ডের মধ্যে দিল্লী সহরময় মশহুর হইয়া গেল আজ নূর বাঈয়ের ঘরে খাস মজলীস।

দুই দণ্ডের মধ্যে লোক আসিতে আরম্ভ হইল। তাঞ্জামে, পাল্কীতে, ঘোড়ায়, লালকিতে ও তখৎ রওয়ানে শত শত দিল্লীবাসী বিলাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। নূর বাঈয়ের হুকুমে অনেক ওস্তাদ আসিল। তাহাদের সঙ্গে ডুলী চড়িয়া পঞ্চাশ জন দিল্লীর প্রসিদ্ধা নর্ত্তকী ও গায়িকা আসিয়া হাজির হইল। কাটরার ফটকের সম্মুখে চল্লিশ পঞ্চাশটা বড় মশাল জ্বলিয়া উঠিল। নূর বাঈয়ের নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও ইরাণী আমীররা কেহ আসিতে পারিলেন না। কারণ শাহান শাহের কড়া হুকুমে তাঁহারা তখন ইরাণে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছিলেন।

বৈঠকখানার দুয়ারে দাঁড়াইয়া নূর বাঈ সকলকে অভ্যর্থনা করিল। সকলকে যথাযোগ্য আসনে বসাইল। নর্ত্তকীদের সাজাইয়া সে মজলীস আরম্ভ করিয়া দিল। সে দিন কড়া হুকুম, মজলীসে সরাব চলিল না। যাহাদের পিপাসা বাড়িল, তাহারা পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সেখানে নীল পায়জামাপরা দুই জন নূতন চাকর সুধা বিতরণ করিতেছিল। মাঝে মাঝে নূর বাঈ উঠিয়া আসিয়া তাহাদের আপ্যায়ন করিতেছিল।

মজলীস জমিয়া গেল। কিন্তু তখন নিমন্ত্রিতরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নূর বাঈ আসর ঠাণ্ডা হইতে দিল না। সকল ঘরে ঘুরিয়া সকলকে জমাইয়া রাখিল। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সে নিজে গাহিল না। কিন্তু আশ্বাস দিয়া রাখিল যে পরে গাহিবে।

ফুলাদ খাঁর নিকট সংবাদ গেল যে নূর বাঈ চিরদিনের মত দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে বলিয়া সমস্ত প্রেমিক ও ভক্তের নিকট বিদায় লইতেছে। শাহান শাহের নিকট খবর গেল যে, নূর বাঈ আজ রাত্রিতে বিদায়-ভোজ দিতেছে।

মহম্মদ শাহের নিকট যখন এ সংবাদ পৌছিল, তখন তিনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন মোগল-সাম্রাজ্যের সরকারী ইতিহাস-কার লিখিয়া গিয়াছেন যে কোহিনূর ছাড়িতেও হিন্দুস্থানের বাদশাহের চোখ দিয়া এত জল বাহির হয় নাই।

ইরাণীরা সংবাদ শুনিয়া হাসিল। দিল্লীর সমঝদার লোক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। নর্ত্তকীরা মনে করিল, এইবার তাহাদের রোজগার বাড়িবে। নূর বাঈয়ের কাটরার সম্মুখে

লোক জমিয়া গেল। যাহারা মদ খাইয়া হল্লা করিতে আসিয়াছিল, ইরাণী সিপাহীরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। ক্রমে দূরে কেল্লার নকারাখানায় বাদশাহী নৌবৎ বাজিয়া উঠিল। তখন নূর বাঈ সাজিয়া আসিয়া আসরে নামিল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে তখন কতক হত-চেতন। কতক অর্দ্ধচেতন কিন্তু বাকি সুস্থ।

সেই রাত্রিতে অনেকে দেখিল যে, লোকে নূর বাঈয়ের মজুরা ছাড়িয়া অন্য কক্ষে মদ খাইবার ছলে নীল পোষাক পরা দুই জন মজুরের সহিত আলাপ করিতেছে তখন আনন্দরাম ও আক্রম জমান খাঁ মজুরের নীল রঙ্গের পোষাকের উপরে একটা সাদা চোগা পরিয়া সমপদস্থ ব্যক্তির ন্যায় ফরাসে বসিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে মজলীস ভাঙ্গিল। যাহাদের তখনও সোজা হইয়া বসিবার ক্ষমতা ছিল, তাহারা ভোজে বসিল। বাকী লোক নিজের বাহনে চড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

ভোজ শেষ হইলে অনেক লোক রহিয়া গিয়াছে দেখিয়া ওস্তাদরা সারেঙ্গীর সুর বাঁধিতে বসিল। কিন্তু নূর বাঈ তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বিদায় দিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকী ও গায়িকারা বিদায় হইল। রহিল কেবল নূর বাঈয়ের পরম ভক্ত প্রেমিক কয়েকজন।

তখন হইতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত পরামর্শ চলিল। প্রভাতে বাদশাহী নৌবৎ যখন ভৈরবী বাজাইল, তখন আনন্দরাম ও আক্রম জমান সম্ভ্রান্ত আমীর সাজিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

নূর বাঈয়ের অর্থের অভাব ছিল না। পরদিন যখন গাড়ী

ভরিয়া পোষাকের বড় বড় বাক্স নূর বাঈয়ের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল, তখন দিল্লীবাসী বা ইরাণী কেহই আশ্চর্য্য হইল না। সকলেই বুঝিল যে, জন্মের মত হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে বলিয়া নূর বাঈ নানা রকমের হিন্দুস্থানের কাপড় কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। সেই দিন হইতে আবার বাদশাহী দরবারে মজলীস আরম্ভ হইল। নূর বাঈয়ের গৃহ লোকারণ্য। কেহ বিদায় লইতে আসিয়াছে। কেহ কাঁদিতে আসিয়াছে। কেহ বা একটা গজল গাহিয়া শুনাইয়া গেল। একজন অতিরিক্ত প্রেমিক শেষবার নূর বাঈয়ের হাতের একখিলি পান খাইয়া গেল।

ফুলাদ খাঁ, তহমাপ্প খাজলের সহিত পরামর্শ করিয়া নূর বাঈয়ের পাহারা বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু নূর বাঈ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের রাজভোগ খাওয়াইতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে দুইজন চারিজন দর্জ্জি আসিতে আরম্ভ করিল। তাহারা নূর বাঈয়ের বাড়ীর ত্রিতলের কক্ষে বসিয়া নানাবিধ পোষাক তৈয়ারী করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে ইরাণী পোষাকই অধিক। ইরাণী সিপাহীরা আসিয়া পোষাক দেখিয়া গেল। যথাসময়ে শাহান শাহ নাদির শাহের নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে হিন্দুস্থানী নর্ত্তকী নূর বাঈ ও তাহার লোকজন একেবারে ইরাণী পোষাক ধরিতেছে। শাহান শাহ হুকুম পাঠাইলেন যে নূর বাঈ ও তাহাদের লোকজন যেন একেবারে ইরাণী না হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে হিন্দুস্থানী পোষাকেরও প্রয়োজন হইবে। শাহান শাহের হুকুম মানিয়া লইয়া নূর বাঈ নানা রকমের হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষের পোষাক তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিল।

মধ্যে একদিন বাদশাহী দরবারে মজলীস বাদ পড়িল। সেই দিন পূর্ব্ব হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া নূর বাঈ এক প্রকাণ্ড মজলীস দিল। কাটরার বিস্তৃত প্রাঙ্গনে সামিয়ানা টাঙাইয়া শতাধিক নর্ত্তকী ও গায়িকা একত্র করিয়া নূর বাঈ নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করিল। সে রাত্রিতে বিশিষ্ট দিল্লীবাসী বা ইরাণী কোন আমীর বাকি রহিলেন না। সমস্ত রাত্রি নৃত্য ও গীত, পান ও ভোজনে সকলকে তুষ্ট করিয়া নূর বাঈ বন্ধুদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার কথা শুনিয়া অনেকে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। কিন্তু যাহারা তাহাকে দেবতার মত মানিত অথবা প্রাণের অধিক প্রিয়জ্ঞান করিত, তাহারা দুইএক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল মাত্র।

শেষ রাত্রিতে গোল উঠিল যে, কাবুল দরওয়াজার দিকে ইরাণী সিপাহীর তাম্বুতে আগুন লাগিয়াছে। ইরাণী আমীররা অনেকেই ব্যস্ত হইয়া বিদায় লইলেন। মজলীস ভাঙ্গিয়া গেল। পথের লোক কমিয়া আসিল। নূর বাঈ স্নান করিতে গেল।

সহসা একদল কিজিলবাস অশ্বারোহী আসিয়া নূর বাঈয়ের কাটরার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহারা পাহারার সিপাহীদের বলিল যে বাঙ্গালী যাদুকর যাদুবিদ্যার বলে বন্দীদের তাঁবুতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। সেই জন্য হুকুম হইয়াছে যে, নূর বাঈয়ের বাড়ীর ডবল পাহারা কমাইয়া সমস্ত লোককে যেন তখনই বন্দীদের তাঁবুতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। হিন্দুস্থানে আসিয়া ইরাণীরা যে সমস্ত রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে নারীরত্নগুলি বন্দীদের শিবিরে সঞ্চিত হইয়াছিল।

পাহারার সিপাহীরা ঘুম-চোখে কেহ বা অস্ত্র ফেলিয়া, কেহ

বা অশ্ব ছাড়িয়া কাশ্মীর ফটকের দিকে ছুটিল। তখনও অন্ধকার একেবারে দূর হয় নাই। তাহাদের জমাদার তহমাষ্প খাঁর হুকুমনামা দেখিয়া অবিশ্বাস করিল না। নবাগত সিপাহীরা পাহারায় রহিয়া গেল। কিন্তু পুরাতন পাহারার সিপাহীদের কাশ্মীর ফটক পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হইল না। অন্ধকারে আর একদল লোক তাহাদিগকে বন্দী করিয়া চারিদিকে লইয়া গেল। কাহাকেও প্রাণে মারিল না।

চৈত্র মাস। কিন্তু দিল্লীতে তখনও গ্রীষ্ম আরম্ভ হয় নাই। দিনের বেলায় ভয়ানক গরম। রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা। বন্দীদের শিবিরে পাহারার সিপাহীরা আগুন জ্বালিয়া রাখিয়াছিল। সেই আগুন লাগুক অথবা অপর কোন আগুন তাম্বুতে লাগিয়া গেল। চারিদিক হইতে বন্দিনীরা ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পাহারার সিপাহীরা তখন আগুন নিবাইতে ব্যস্ত। কোথা হইতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন ইরাণী সিপাহী ঠিক সেই সময়ে সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিল তাহা বুঝিবার অবসর তাহাদের হইল না। নূতন সিপাহীদের অনেকেই বন্দিনীদের সামলাইতে ব্যস্ত হইল। কেবল দুই চারিজন পাহারার সিপাহীদের সঙ্গে আগুন নিবাইতে আসিল।

আগুন নিবিয়া গেল। কিন্তু দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে সঞ্চিত রত্নের সন্ধানে ইরাণী সিপাহীরা ছুটিয়া আসিল। ক্রমশঃ শেষ রাত্রিতে যাহারা পাহারার সিপাহীদের সাহায্য করিতে আসিয়াছিল তাহারা সরিয়া পড়িল। অন্য সিপাহীরা আসিয়া তাহাদের গচ্ছিত ধনের সন্ধান পাইল না।

সকলেই বলিতে আরম্ভ করিল যে, সঞ্চিত রত্ন সংখ্যায় অনেক কমিয়া গিয়াছে।

সকল তাম্বু পুড়িয়া গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে রত্নের ফর্দ্দও পুড়িয়া গিয়াছিল। সুতরাং ফর্দ্দ মিলাইয়া লওয়া সম্ভব হইল না। পরদিন বৃহস্পতিবার ও তাহার পরদিন শুক্রবার হিন্দু ও মুসলমানের ভগবানের চরণে নিবেদন দেখিয়া ইরাণীরা বিস্মিত হইয়া গেল। নাদির শাহের দিল্লী প্রবেশের পরে মন্দিরে ও মসজেদে এত অধিক জন সমাবেশ আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পূজা ও নামাজের পরে হিন্দু ও মুসলমান এক হইয়া গেল। নাদির শাহ ভীত হইয়া বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত রহিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কাশ্মীর ফটক

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা কাশ্মীর ফটকের চৌকী বা পাহারা ফটকের দুই দিকে ছোট কামরাগুলিতে খাটিয়া পাতিয়া পড়িয়া ছিল। কেবল একজন জমাদার ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দস্তক বা ছাড়পত্র পরীক্ষা করিয়া গাড়ী ও লোক ছাড়িতেছিল। বাহির হইতে অল্প লোকই আসিতেছিল। কিন্তু দিল্লীর বাহিরে যাইবার প্রার্থী অনেক। তাহারা অনেক কষ্টে অনেক পয়সা খরচ করিয়া দস্তক যোগাড় করিয়াছিল। কাশ্মীর ফটকের ভিতরের দিকে গাড়ী, রথ ও ঘোড়ার অসম্ভব ভিড়। জমাদার এক এক করিয়া গাড়ী ও রথ ছাড়িতেছিল। ভিড়ের মধ্যে একজন ভিখারী একটি সারেঙ্গী বাজাইয়া গান করিতেছিল।

তখন গ্রীষ্ম বাড়িয়া উঠিয়াছে। সরবৎওয়ালারা মিঠা সরবৎ ফিরি করিতেছে। ভিস্তিরা জল বেচিতেছে। একজন তামাকু-বরদার একটা বড় হুকা হাতে করিয়া সকলকে ধূমপান করাইতেছে। এক একখানি গাড়ী, এক একখানি রথ বা এক একটি ঘোড়া ছাড় পাইয়া লাহোর অথবা কাবুলের পথ ধরিতেছে। অন্ধকারে দুই একটি আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে। কাশ্মীর ফটকের উপর হইতে একটি বড় পিতলের লণ্ঠনে একটা প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। কিন্তু জমাদারের কাছে একজন সিপাহী একটা নারিকেল তৈলের মশাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া

আছে। জমাদার এক এক করিয়া দস্তক পড়িতেছে, "ইসফান্দিয়ার বেগ, একখানা রথ, চারিজন মানুষ, যাও।"

রথ বহির হইয়া গেল। অন্ধকার ঘন হইয়া আসিল। কিন্তু সহরের ভিতর রাজপথে বেশী আলো জ্বলিল না। গাড়ী ও রথের ভিড় তখনও কমিতেছে না। গুর্জর ও জাঠ দস্যুদের জন্য অন্ধকারে পথ চলা বিপজ্জনক। তথাপি দিল্লীবাসী দিল্লী ছাড়িয়া পালাইতে পারিলে বাঁচে। যাহারা ধনী তাহারা কর্নালের যুদ্ধের পরাজিত মোগল সৈন্য দুই চারিজন মাহিনা দিয়া রাখিয়াছে এবং পাহারা দিবার জন্য তাহাদের সঙ্গে লইয়াছে।

সন্ধ্যার দুই দণ্ড পরে কাশ্মীর দরজার ভিতরের দিকে হঠাৎ হল্লা উঠিল। চল্লিশ পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী ইরাণী সিপাহী ভিড়ের পিছনে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "তফাৎ তফাৎ, রাস্তা ছাড়!" কিন্তু রাস্তা ছাড়িবার উপায় কোথায়? দিল্লী হইতে পলাইবার আশায় যাহারা দস্তক যোগাড় করিয়াছিল, তাহারা জমাট বাঁধিয়া কাশ্মীর ফটক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের পিছু হটিবার বা সম্মুখে অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। দুই ধারে চাবুক কসিয়া, ঘোড়া ঠেলিয়া নূতন সিপাহীদের জমাদার ফটকে পৌঁছিল এবং সেখানকার চৌকীর জমাদারকে একখানা হুকুমনামা দেখাইল। তাহাতে লেখা ছিল, "দিল্লীতে ফকিররা বিদ্রোহী হইয়াছে। তুমি পত্রপাঠ নূতন জমাদারকে কাশ্মীর ফটকের চৌকী ছাড়িয়া দিবে এবং তোমার চৌকীর সিপাহী লইয়া দরিয়া বাজারে চলিয়া যাইবে।"

জমাদার হুকুমনামা পাইয়া নিজের সিপাহীদের একত্র করিল এবং অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া চলিয়া গেল। নূতন চৌকীর জমাদার বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক। তাহার ভিড় কমাইতে বেশীক্ষণ লাগিল না। সে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ী, রথ ও ঘোড়া ছাড়িয়া দিতে লাগিল। দুই দণ্ডের মধ্যে পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। তখন নিকটের একটি গলির মুখ হইতে অসংখ্য উট সারি দিয়া বাহির হইল। প্রত্যেক উটের পিঠে বড় বড় তাঁবুর বোঝা। তাহাদিগের সঙ্গে মাত্র দশ জন অশ্বারোহী ছিল। কাশ্মীর ফটকের চৌকীর জমাদার হাঁকিল, "কি আছে?"

একজন সওয়ার উত্তর দিল, "শাহান শাহের পেশখানা।"

বাদশাহ বা বড় আমীররা দূর দেশে যাত্রাকালে দুই তিন সেট তাঁবু ব্যবহার করিতেন। এক সেট এক দিনের পথ, আর এক সেট দুই দিনের পথ গিয়া আগে হইতে খাটান হইত। দস্তক দেখিয়া নূতন জমাদার উটের শ্রেণী ছাড়িয়া দিল। প্রায় দুইশত উট বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাহারার আট দশ জন সিপাহী চৌকীর সমস্ত ঘোড়া লইয়া তাহাদের সঙ্গে সরিয়া পড়িল।

উটের দল কাশ্মীর ফটক পার হইবার এক দণ্ডের মধ্যে এক একজন করিয়া কাশ্মীর ফটকের চৌকীর সিপাহী সরিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে ফটক জনশূন্য হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে আর একদল যাত্রী আসিল। কিন্তু ফটকে পাহারা নাই দেখিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া গেল। তাহারা প্রায়

এক দণ্ড কাল নিরুপায় হইয়া অপেক্ষা করিল। শেষে পিছু ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে তাহারা বাহির হইয়া গেল।

আরও একদণ্ড কাটিয়া গেল। দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা গেল। পথে যে দুই এক জন লোক ছিল, তাহারা সরিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে কাশ্মীর ফটকের পুরানো চৌকীর পাহারা ঘোড়া ছুটাইয়া আসিল। ফটকে আসিয়া কেহই নাই দেখিয়া তাহাদের মধ্যে আট জন ফটকের দুই পার্শ্বে সারি দিয়া দাঁড়াইল। বাকি লোক ঘোড়া ছুটাইয়া দিল্লীর বাহিরে চলিয়া গেল। পুরাতন চৌকীর জমাদার নূতন চৌকীর জমাদারের নিকট হইতে যে হুকুমনামা পাইয়াছিল তাহা বাহির করিয়া মশালের আলোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তাহাতে কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর সহী, ইরাণী সেনাপতি তহমাস্প-খাজলের মোহর, সমস্তই ঠিক আছে। জমাদার বিশ্বাস করিতে না পারিয়া একবার চক্ষু মুছিল। তারপর হুকুমনামা আবার ভাল করিয়া পড়িল। সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার দলের সিপাহী আর দুই এক জন পড়িতে জানিত। সে তাহাদের ডাকিয়া হুকুমনামা পড়াইল। কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাহারা অবাক হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। হুকুমনামা ঠিক। সহী মোহর ঠিক। অথচ তাহারা দরিয়া-বাজারে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সেখানে ফকীরও নাই। বিদ্রোহও নাই। শুধু তাহাই নহে। কাশ্মীর ফটকে ফিরিবার সময় পথে তাহাদিগের সহিত অন্য ফটকের চৌকীর সিপাহীদের সহিত

দেখা হইয়াছে এবং তাঁহাদের কাছে শুনিয়াছে যে তাহারাও ঐরূপ হুকুমনামা পাইয়া নূতন সিপাহীদের কাছে ফটকের পাহারা ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কেহ বা দরিয়া বাজারে যাইবার আদেশ পাইয়াছে, কেহ বা বাদশাহী মণ্ডী, কেহ ফতেপুরী বাজার, কিন্তু সকলেই দেখিয়া আসিয়াছে যে সংবাদ মিথ্যা। কোন স্থানেই ফকির অথবা বিদ্রোহ নাই। জমাদার অনেক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে একজন সওয়ারকে তুর্কমান ফটকে ও আর একজনকে কাবুল ফটকে পাঠাইয়া দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। যে সকল সওয়ার কাশ্মীর ফটক দিয়া বাহির হইয়া গিয়া নূতন চৌকীর সওয়ারদের খুঁজিতে গিয়াছিল তাহারাও ফিরিয়া আসিল। পথের ধারে এক যায়গায় পুরাতন ছেঁড়া তাঁবুতে আগুন লাগিয়া আছে। কিন্তু নূতন চৌকীর সিপাহীদের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তুর্কমান ও কাবুল ফটক হইতেও সিপাহীরা ফিরিয়া আসিল। এই দুই ফটকেও পুরাতন চৌকীর সিপাহীরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিয়াছে যে নূতন চৌকীর পাহারা ফটক খুলিয়া রাখিয়া পলাইয়াছে।

জমাদার তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহারা যতক্ষণ ছিল না ততক্ষণ তাহারা যে কি করিয়াছে, তাহা ভগবানই জানেন। তাহার অপরাধ যে কতদূর গভীর, তাহা সে তখনও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল যে মোগল কোতোয়াল ও ইরাণী সেনাপতি এই দুইজনকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

তৎক্ষণাৎ তাহার হুকুমে দুইজন সওয়ার তহমাপ্স খাজলের ও কুলাদ খাঁর নিকট ছুটিল। তাহারা কোতোয়ালী ও কিল্লার লাহোর ফটকে গিয়া অবাক হইয়া গেল। দিল্লীময় সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকে হরকরা, চোপদার, নসকৃচী ছুটিয়েছে। প্রকৃত সংবাদ কেহই দিতে পারিতেছে না। কেহ বলিতেছে বিদ্রোহ উপস্থিত। কেহ বলিতেছে যাদু। সকলেই শাহান শাহের ভয়ে অস্থির। অথচ কেহই কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছে না। সকল ফটকের সংবাদ আসিলে বুঝিতে পারা গেল যে, দিল্লী, আজমীর, তুর্কমান, কাশ্মীর ও কাবুল ফটকে একদল লোক ইরাণী সিপাহী সাজিয়া জাল হুকুমনামা আনিয়া আসল পাহারার সিপাহীদের ভুলাইয়া অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহার পরে যে কি হইয়াছে, সে কথা কেহই বলিতে পারে না।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি তহমাপ্স খাঁ বুঝিলেন যে, ষড়যন্ত্র করিয়া দিল্লীর লোক কয়েদী সরাইয়াছে। তাঁহার হুকুমে তখনই চারিদিকে লোক ছুটিল। দলে দলে ইরাণী সওয়ার এই পাঁচ দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তাহারা ইরাণী বিদেশী। একদল অন্ধকারে পথ হারাইল। তারপর তাহারা গুজর ও জাঠ গ্রামবাসীদের হাতে পড়িয়া মরিল। অন্যান্য দল কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। এই ঘটনাগুলি ঘটিতে ঘটিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। তখন শাহান শাহ নাদির শাহের নিকট সংবাদ পৌছিল। হুকুম হইল, ইরাণী সিপাহী গণনা করা হউক। আর দিল্লী সহরময় খানাতল্লাসী হউক।

দিল্লীবাসী খানাতল্লাসীর নাম শুনিয়া ভয়ে কাঁপিল। অনেক সম্ভ্রান্ত আমীর, এমন কি খোদ চীন কিলিচ খাঁ নিজাম উল-মুল্ক পর্য্যন্ত শাহান শাহের দরবারে হাজির হইয়া সম্ভ্রান্ত দিল্লীবাসীর আবরু বাঁচাইবার জন্য দয়া ভিক্ষা করিলেন।

খানাতল্লাসের হুকুম রদ হইল না। সেদিনকার মত মকুব হইল মাত্র। যথাসময়ে নূর বাঈয়ের প্রেমিকরা শত শত সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদিগকে কর্নাল, রেবাড়ী ও মথুরায় পৌঁছাইয়া দিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

নূর বাঈয়ের পোষাক

সহরময় হাহাকার রব উঠিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ উঠিয়া গিয়াছে। চারিদিকে হতাশার আর্ত্তনাদ, কারণ কিজিলবাস, তুর্কমান ও তাতার জাতি নির্ব্বিশেষে সুন্দরী রমণী দেখিলেই বিনা বাক্যব্যয়ে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। বিশাল দিল্লী নগর নিরানন্দ। পিতা পতি পুত্রের আর্ত্তনাদে, মাতা ভগিনী কন্যার করুণ ক্রন্দনে দিল্লী যখন পরিপূর্ণ, তখন নিত্য উৎসবের আনন্দ কোলাহলে চাঁদনীচোক মুখরিত। সারেঙ্গী, বীণা ও মৃদঙ্গের মধুর আওয়াজে পথে তখনও লোক দাড়াইয়া যায়। নূর বাঈয়ের ব্যবহারে হিন্দু ও মুসলমান সমানভাবে মর্ম্মাহত। হিন্দুস্থানের বাদশাহ মহম্মদ শাহ সংবাদ শুনিয়া মস্তক অবনত করিলেন। শাহান শাহ নাদির শাহ ঈষৎ হাসিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, নর্ত্তকী নূর বাঈ তাঁহার উদীয়মান গৌরবসূর্য্যের প্রভায় মোহিত হইয়াছে।

হঠাৎ নূর বাঈ দরখাস্ত করিল যে, তাহার এলবাস পোষাক সে কিছুদিন পূর্ব্বেই ইরাণে পাঠাইতে চাহে। সুতরাং তাহাকে নিত্য দশ গাড়ী মাল পাঠাইতে হুকুমনামা ও দস্তক দেওয়া হউক। তহমাস্প খাজল অনেক আপত্তি করিল, কিন্তু নাদির শাহ তাহা মানিলেন না। হুকুমনামা ও দস্তক চলিয়া গেল। পরদিন দশগাড়ী মাল কাশ্মীর ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল।

দস্তক ও হুকুমনামা সত্ত্বেও তহমাস্প খাঁ গাড়ী আটকাইয়া সমস্ত মাল নামাইয়া সন্ধান করিয়া কিছুই পাইলেন না। এই সংবাদ নাদির শাহের কর্ণে পৌছিল। সুতরাং তহমাস্প খাঁ প্রভুভক্তির ফলে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তিরস্কার লাভ করিলেন। তখনও দিল্লিতে যত সারেঙ্গী, সেতার, সুরবাহার, এসরাজ, বীণা ও রবাব ছিল নূর বাঈয়ের লোক কিছু কিছু করিয়া সমস্তই কিনিয়া আনিল। বড় বড় কাঠের খাঁচায় বাদ্যযন্ত্র, বড় বড় কাঠের বাক্সে নানাবিধ পোষাক ব্যতীত প্রথম দিনে তহমাস্প খাঁ আর কিছুই দেখিতে পান নাই। ভয়ে ভয়ে আনন্দরাম ও আক্রম জমান দ্বিতীয় দিনেও আর কিছুই পাঠান নাই। তৃতীয় দিনে উপরে দুই চারিটা বাদ্যযন্ত্রের কাঠের খাঁচা ব্যতীত বাক্সভরা স্ত্রীলোক ও বালিকা নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইয়া গেল। কলকণ্ঠ ও অতুলনীয় রূপ দিল্লীর পথে পথে বিক্রয় করিয়া যে অগাধ ধনসম্পত্তি সে এতদিনে সঞ্চয় করিয়াছিল, মহীয়সী নূর বাঈ আজ তাহা অকাতরে দিল্লীবাসীর জন্য আবার দিল্লীর পথে লুটাইয়া দিল। তাহার গৃহে বীণা ও মৃদঙ্গের মধুর রব ও নৃত্যচটুল চরণে নূপুরনিক্কণ শুনিয়া হিন্দু ও মুসলমান দিল্লীবাসী যখন নূর বাঈকে অশ্রাব্য কটু ভাষায় প্রকাশ্যে অভিনন্দিত করিতেছিল, তখন বেশ্যাকন্যা নূর বাঈ অকুন্ঠিত চিত্তে তাহার যথাসর্ব্বস্ব দিল্লীর নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ব্যয় করিতেছিল। সঞ্চিত ধন ফুরাইল। অঙ্গের বহুমূল্য রত্নখচিত অলঙ্কার বিক্রীত হইল। বহুমূল্য শাল, জামিয়ার, কিংখাব ও তাসা অর্দ্ধমূল্যে

হস্তান্তর হইয়া গেল। তখন নিরলঙ্কারা কস্‌বী নূর বাঈ ভিক্ষায় বাহির হইল।

সে কথা শুনিয়া বহুদর্শী জ্ঞানবৃদ্ধ কিলীচ খাঁ নিজাম-উল-মুলক আসফ্ জাহ্ তাহার গৃহে আসিয়া তাহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া তাহার পদতলে উষ্ণীষ রাখিয়া গেলেন। নূর বাঈ সেই দিন আনন্দরামকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

আনন্দরাম ও আক্রম জমান অতি ধীরে, অতি সঙ্গোপনে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাছা বাছা বিশ্বাসী লোক ব্যতীত আর কেহই প্রকৃত কথা জানিতে পারে নাই। দশ দিন ধরিয়া নিত্য দশ গাড়ী পোষাক ও বাদ্যযন্ত্র দিল্লীর বাহিরে চলিয়া গেল। আনন্দরামের ব্যবস্থায় পোষাক ও বাদ্যযন্ত্র ময়দার থলিয়ায় ও তরকারীর বাজরায় চারিদিক হইতে আবার দিল্লীতে ফিরিয়া রাত্রিকালে নূর বাঈয়ের গৃহে পৌঁছিতে লাগিল। ক্রমে তহমাস্প খাঁর সন্দেহ আবার বাড়িয়া উঠিল। তিনি একদিন প্রকাশ্য দরবারে নাদির শাহের নিকটে নূর বাঈয়ের পোষাকের গাড়ী সন্ধান করিবার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু পাইলেন না। দশ দিনে আন্দাজ দুই সহস্র দিল্লীবাসী রমণী দিল্লীর বাহির হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু তখনও শত সহস্র হিন্দু ও মুসলমান নারী দিল্লীতে অবরুদ্ধ। উপায়ান্তর না দেখিয়া আনন্দরাম ও আক্রম জমান বিদ্রোহের ব্যবস্থা করিলেন।

ফকীর শাহ লুৎফ উল্লা দীর্ঘকাল লচ্ছেদার রাবড়ী ভোগ করিয়া দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রাবড়ী খোদার

আদেশে বন্ধ হইবার ভয় দেখাইয়া আনন্দরাম তাহাকে সত্য সত্যই বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। ছিটার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া শাহ সাহেব একদিন ফতেপুরী মসজেদে আসিয়া ডঙ্কার আওয়াজে জারী করিয়া দিলেন যে খোদাতালা কাফের মহম্মদ শাহের পরিবর্ত্তে তাহাকে হিন্দুস্থানের বাদশাহী দিয়া শিয়া নাদির শাহকে দূর করিয়া দিতে হুকুম দিয়াছেন। আক্রম জমান পেশ ইমাম সাজিয়া নূতন বাদশাহের নামে খোৎবা পড়িল। ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। সহরময় সোরগোল পড়িয়া গেল। ক্রমে খবর তহমাপ্প খাঁর কর্ণে পৌঁছিল। তিনি প্রথমে সংবাদ বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই, কিন্তু ক্রমশ: যখন খবর আসিতে লাগিল যে ফটকে ফটকে সিপাহী তাড়াইয়া দিয়া নূতন বাদশাহের লোক রাস্তা ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন তহমাপ্প খাঁকে বাধ্য হইয়া শাহান শাহের দরবারে খবর দিতে হইল। তৎক্ষণাৎ চারিদিকে ফৌজ ছুটিল, মুর্দ্ধা হইতে তোপ নামাইয়া পথে বসান হইল। দেখিতে দেখিতে চারিদিকের সমস্ত ফটক আবার বন্ধ হইয়া গেল। নাদির শাহের তরফে তহমাপ্প খাজলের ও মহম্মদ শাহের তরফে লুৎফ উল্লা খাঁ সাদেক মোরী ফটকের নিকট গিয়া দেখিলেন যে পথের ধারে একটা মসজেদের সম্মুখে দুই তিন শত লোক ফকীরের সবুজ পোষাক পরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে "দীন" "দীন" বলিয়া চেঁচাইতেছে। তাহাদিগের দিকে সওয়ার ছুটাইবামাত্র তাহারা অদৃশ্য হইল। সওয়াররা মসজেদের সম্মুখে গিয়া দেখিল যে, একটা উচ্চ কাষ্ঠাসনের

উপরে ঝুটা জরীর পোষাক পরিয়া ও রাবড়ীর ভাঁড় সম্মুখে লইয়া একজন আধা-বয়সী মুসলমান বসিয়া আছে। তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল যে, সে হিন্দস্থানের বাদশাহ। তাহার নাম লুৎফ উল্লা শাহ। তাহার আকার ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া তহমাপ্প ও লুৎফ উল্লা খাঁ সাদেক তুই জনেই হাসিয়া আকুল হইলেন। বাদশাহ লুৎফ উল্লা শাহ গম্ভীরভাবে তাহাদিগকে জানাইল যে, নাদির শাহ শিয়া, সুতরাং কাফের। মহম্মদ শাহও কাফের। কারণ তাহার রাজ্যে ভক্ত মুসলমান ফকির রাবড়ী পায় না, সুতরাং পবিত্র মুসলমান ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য খোদা তাহাকে হিন্দুস্থানের বাদশাহী দিয়াছেন। তহমাপ্প খাঁ নূতন বাদশাহকে উঠিতে বলিলে সে তঞ্জাম অথবা পালকী চাহিল। পল্লী হইতে তঞ্জাম যোগাড় করিয়া আনিয়া তহমাপ্প খাঁ ও লুৎফ উল্লা খাঁ সাদেক নূতন বাদশাহকে লইয়া প্রাসাদে যাত্রা করিলেন।

প্রকাশ্য দরবার-ই-আমে শাহান শাহ নাদির শাহ ও বাদশাহ মহম্মদ শাহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া লুৎফ উল্লা তাহার বাদশাহীর ইতিহাস আনন্দরামের মুখে যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই বলিয়া গেল। সে কহিল যে, কাফের মহম্মদ শাহের অত্যাচারে দিল্লী শহরে যখন দুধ মিলিল না, তখন সে চিটাগুড় গুলিয়া শোলা ভিজাইয়া চুষিতে চুষিতে অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। ঈশ্বর হিন্দুস্থানের গুলীখোরদের দুঃখে অভিভূত হইয়া রাবড়ীর বাগান সমেত এক দেবদূতকে পাঠাইয়া দিলেন। সে বাগানে ডালে ডালে দুধের জালা এবং পাতায়

পাতায় লচ্ছেদার রাবড়ী। রাবড়ী পাইয়া ছুনিয়ার গুলীখোর বাঁচিল এবং ছুই হাত তুলিয়া ঈশ্বরকে আশীর্ব্বাদ করিল। ছুই দিন পূর্ব্বে ঈশ্বর আবার তাহার নিকটে ছুই জন দেবদূত পাঠাইয়া দিয়া জানাইয়াছেন যে, কাফের নাদির শাহকে হিন্দুস্থান হইতে দূর না করিলে তাহার বাদশাহী যাইবে না এবং রাবড়ীর রসদ বন্ধ হইবে।

নাদির শাহ গম্ভীর হইয়া সকল কথা শুনিয়া গেলেন এবং নকারাখানার উপরে নূতন বাদশাহকে কয়েদ করিতে হুকুম দিয়া পুরাতন বাদশাহ মহম্মদ শাহের সহিত গোসলখানায় চলিয়া গেলেন। রাবড়ীর ভাঁড় কাড়িয়া লওয়ায় নূতন বাদশাহ লুৎফ উল্লা শাহ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদায়

সকল উপায় শেষ করিয়া আনন্দরাম ও আক্রম জমান নূর বাঈয়ের নিকট বিদায় লইয়া আসিল। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নূর বাঈ তখনও যে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই জপ করিতেছিল। তাহার অনুগ্রহে, তাহার সুপারিশে তখনও শত শত হিন্দু মুসলমান মহিলা মুক্তি লাভ করিতেছিল। শাহান শাহ নাদির শাহের তখনও নূর বাঈয়ের উপরে অগাধ বিশ্বাস। তখনও নূর বাঈয়ের খাতিরে প্রাণদণ্ড রদ হইতেছে, বন্দী মুক্তি পাইতেছে এবং ফকীর রাজ্যেশ্বর হইতেছে।

আনন্দরাম যখন আসিল, তখন নূর বাঈ রাস্তার উপরের বারান্দায় বসিয়া সটকায় তামাকু টানিতেছিল। বিনানুমতিতে দুই জন পুরুষ তাহার নিকট আসিল। দেখিয়াই সে বুঝিল যে, তাহারা আনন্দরাম ও আক্রম জমান। নূর বাঈ তাহাদিগকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি ?"

আনন্দরাম বলিল, "একটা কথা আমরা দুজনে মীমাংসা করতে পারছি না, সেই জন্য তোমার কাছে এসেছি।"

নূর বাঈ একটু হাসিয়া বলিল, "বাবুজী, তোমরা বিদ্বান্ বুদ্ধিমান পুরুষ মানুষ হয়ে যে জিনিষের মীমাংসা করতে পারছ না, আমি স্ত্রীলোক হয়ে তার কি মীমাংসা করব ?"

"এ সকল কথার মীমাংসা তোমরাই ভাল রকম পার।

আমরা কোনদিন পারি না। সাহেব জাদা আক্রম জমানকে বলছি যে আপনার কাজ যখন শেষ হয়েছে, তখন আপনি গোলাপীকে নিয়ে এলাহাবাদ, না হয় আওরঙ্গাবাদে চলে যান।"

আক্রম জমান সহসা বলিয়া উঠিল, "আর তুমি ?"

আনন্দরাম একমুখ হাসিয়া বলিল, "এই মাত্র দিব্য করেছ সাহেব জাদা যে, আগে আমাকে আমার কথাটা বলে শেষ করতে দেবে।"

আক্রম জমান মুখ নীচু করিয়া বলিলেন, "তাই কর।"

তখন আনন্দরাম আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "দেখ বহিন্, এ সংসারে আপনার বলতে আমার কেউ নেই। যারা আছে, দেশে ফিরে না গেলে তারা খুসী হবে। আনন্দরাম ম'লে কাঁদবে কেবল বাবার আমলের বুড়া বাগ্‌দী চাকরটা। সেই জন্য পরম নিশ্চিন্ত মনে তলোয়ারের নীচে মাথাটা পেতে দিতে পারি। আর নিজের জীবনটা নিয়ে নিত্য জুয়া খেলি।"

হঠাৎ নূর বাঈ বলিয়া ফেলিল, "কিন্তু বাবুজা, পদ্মিনী ?"

আনন্দরাম কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া বলিল, "ও কথা বলবে, তা জানি বহিন্। কিন্তু ভেবে দেখ, পদ্মিনী আমার কে ? আমি বাঙ্গালী কায়স্থ, সে পাঞ্জাবী বিধবা, ক্ষত্রিয়াণী। এ দেশে এসে লক্ষ্মীর কাছে আর পদ্মিনীর কাছে ভগিনীর স্নেহ পেয়েছি। দীর্ঘকাল তাদের বাড়ীতে ছিলাম, তাদের কাছে শেষ বিদায় নেবার পূর্ব্বে সকলকে নিরাপদ স্থানে রেখে আসব। আর কি বল ?"

কোন অজ্ঞাত কারণে নূর বাঈয়ের চোখ দুইটা জলে

ভরিয়া আসিয়াছিল। সে চোখে রুমাল দিয়া বলিল, "তোমরা পুরুষরা যত সহজে ছাড়িয়ে যেতে চাও, আমরা যে তত সহজে ছাড়তে পারি না। দেখ বাবুজী, বাঙ্গালী আর পাঞ্জাবী আমাদের রাখা নাম, আমাদের হুকুমের তফাৎ। কিন্তু যে উপরওয়ালা বাঙ্গালী আর পাঞ্জাবীকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সে প্রভেদ গড়ে তোলেন নি। যদি তুমি কেবল বাঙ্গালী, তবে ইরাণীর খোলা তলোয়ারের নীচে মাথা পেতে দিয়ে দিল্লীতে বেড়াচ্ছ কেন? তোমার ধন আছে, দৌলত আছে, রূপ আছে, যৌবন আছে, শান্তিময় দেশ আছে, দিল্লীর পাঞ্জাবীর জন্য তোমার প্রাণ আকুল হয় কেন?"

"কেন হয়, তা বলতে পারিনা বহিন্, তবে হয় যে সে কথা লুকান অসম্ভব। গোলাপীর জন্য যতটা চিন্তিত হয়েছিলাম, তোমার জন্যও ঠিক ততটা ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া লইয়া আক্রম জমান বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু পদ্মিনীর জন্য সকলের চেয়ে বেশী।"

নূর বাঈ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—আনন্দরাম ভীষণ অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। যখন তাহার কথা ফুটিল, তখন উপহাসের ভয়ে সে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "তোমরা যাই বল, আমি নিজের মন স্থির করে ফেলেছি। পদ্মিনী আর লক্ষ্মীর কাছে চির-বিদায় নিতে যাচ্ছি। সাহেবজাদা, তুমি বলেছ যে বাঙ্গলা দেশে আর কখনও ফিরবে না। যদি পার, লক্ষ্মী আর তার অনাথিনী ভগিনী পদ্মিনীকে দেখ। বহিন্, যদি আমাকে কণামাত্র ভালবেসে থাক, তা হ'লে সেই দূর

ইরাণ দেশ থেকে যতদূর পার, লক্ষ্মীকে আর পদ্মিনীকে বিপদ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা কর।”

আনন্দরামের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নূর বাঈ তাহার হাত দুইখানা টানিয়া ধরিল। আনন্দরাম বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার দুঃখ দেখিয়া নূর বাঈ ও আক্রম জমান কেবল হাসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে নূর বাঈ জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাচ্ছ, ভাই?”

আনন্দরাম চোখ মুছিয়া বলিল, “যাচ্ছিলাম লক্ষ্মীর কাছে বিদায় নিতে। তুমি যদি এখন আটকে রাখ, তা হ'লে আর একদিন যাব। কারণ তোমার হাত ছাড়িয়ে যাবার শক্তি আমার আর নেই।”

সহসা আনন্দরামের হাত ছাড়িয়া দিয়া নূর বাঈ উঠিয়া দাঁড়াইল। আক্রম জমান আলবোলায় মুখ লাগাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সে নূর বাঈয়ের মুখের ভাব দেখিয়া চমকিয়া গেল। নূর বাই বলিল, “ভাই, যাব মনে করলেই কি যাওয়া যায়? বিদায় নিতে ইচ্ছে করলেই কি বিদায় পাওয়া যায়? একবার আমার কথাটা ভেবে দেখ। একদিন হিন্দুস্থানের বাদশাহ মহম্মদ শাহ আমার গোলাম ছিলেন। সুতরাং কেবল দিল্লী সহরে কেন, সারা হিন্দুস্থানে আমার মত ক্ষমতা আর কারও ছিল না। ইরাণী শাহান শাহ যখন এলেন, তখন মনে করেছিলুম যে, পালিয়ে যাব। যতদিন রূপ আছে, যৌবন আছে, ততদিন যেখানে যাব, সেইখানেই রোজগার। তখনও ধন দৌলত লোকজন সমস্তই ছিল। কিন্তু যেতে পেরেছিলাম কি? কোথায় যাবে

তুমি ভাই? আমার চোখের বড় নজর তুমি ফুটিয়ে দিয়েছ, অথচ আজ তুমিই এই মোটা কথাটা বুঝতে পারছ না। দেখ, আমি কেমন আনন্দে সোনার হিন্দুস্থান ছেড়ে শাহান শাহের সঙ্গে ইরাণে চলেছি।”

আনন্দরাম অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নূর বাঈ আবার বলিতে আরম্ভ করিল, “এখন বুঝতে পারবে না। একবার মনে করে দেখ কার জন্য সে দিন নূর বাঈ সেজে কিজিলবাসের তলোয়ারের নীচে মাথা পেতে দিতে গিয়েছিলে? আমার গর্ভধারিণী মাত্র দশটি টাকার জন্য আমাকে আর এক কসবীর কাছে বেচে, চিরজীবন দিল্লীর পথে দেহ বিক্রয় করতে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তোমার কে? তুমি আমার মাস্থক নও, কোন দিন একটা ফুল, অথবা এক ফোঁটা আতর দিয়ে আমাকে মনের ভাব জানাও নাই, অথচ আমার যেদিন বিপদ হ'ল সেদিন আমার হাজার হাজার প্রেমিক ছিল, সেদিন মরণের দুয়ারে দাঁড়িয়ে, আমার তোমাকে ছাড়া আর কাউকে মনে হয় নি, জান? সেদিন মনে হ'ল যে দিল্লীতে তুমিই একটা মানুষ, আর সব পশু। ভাই, সবাই খায়, সবাই ঘুমায়, সবাই—কাক, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত রোজগার করে স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করে; কিন্তু পরের জন্য যার প্রাণ কাঁদে, সেই মানুষ। অথচ এমন মানুষ অনেক আছে, কিন্তু সহজে তাদের চিনতে পারা যায় না। সকল মানুষের উপরওয়ালা একজন আছে, সেই তোমার মত মানুষ কখনও কখনও চিনিয়ে দেয়। যা কচ্ছিলে, তাই কর যা করবে মনে করেছ, তা হবে না। সুতরাং ছেড়ে দাও। যে

তোমায় চিনিয়ে দিয়েছে, সেই বলে দিয়েছে, আমি বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। অথচ তুমি কেন শুনতে পাচ্ছ না, জানি না।"

আক্রম জমান এতক্ষণ একদৃষ্টিতে নূর বাঈয়ের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "বিবি সাহেবা, একটা ছিলিম হুকুম কর। বাবুজী, পাগল হোয়ো না। দেখ, আমি মাতাল বলে আমার কথা অবহেলা কর না। বিবি সাহেবা যা বলছেন, খুব ঠিক। দেখ বাবুজী, খোদার মরজিতে সময়ে সময়ে সকল দেশে এক একটা মহাপ্রলয় আসে। আজ হিন্দুস্থানে খোদার মরজিতে তুফান এসেছে। এমন সময় জাতি থাকে না, ধর্ম্ম থাকে না, মান ইজ্জত থাকে না। আর পরে কি হবে, কেউ বলতে পারে না। দেখ বাবুজী, তুমি যা করছ, তোমার হুকুমে বনমালী আর কালে খাঁর মত বিবি সাহেবা আর আমিও ঠিক তাই করছি। অথচ বেশ বুঝতে পারছি যে, আর একজন উপরওয়ালা তোমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ তোমার বিপদ আছে, কারণ তোমার মগজ বিগড়েছে। একটু বস, তামাকটা টেনে নিই, তারপর যেখানে যাবে, চল।"

সেই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে শোভারাম সংবাদ দিতে আসিয়াছে। সে নূর বাঈয়ের হুকুম লইয়া পাঠানবেশী শোভারামকে সেই ঘরে আনিল। শোভারাম জানাইল যে, প্রাণের ভয়ে দুই চারি জন দিল্লীবাসী নূতন বাদশাহ লুৎফ উল্লা শাহের বিদ্রোহের সকল কথাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। লুৎফ উল্লা ফকির ও পদ্মিনীদের বাড়ী ইরাণী

ফৌজ লুঠ করিয়াছে। আনন্দরামকে যে যেখানে চিনিত, শাহান শাহ নাদির শাহ তাহাদের সকলের উপরে হুকুম করিয়াছেন যে যেমন করিয়া পারে, আনন্দরামকে ধরিয়া আনিতে হইবে। আনন্দরামের দুঃখ শোক এক মুহূর্ত্তে অতীত হইল। সে হাসিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। নূর বাঈ উল্লাসে পান সাজিতে বসিয়া গেল। আক্রম জমান নূতন ছিলম পাইয়া নূতন উৎসাহে টানিতে আরম্ভ করিল। শোভারাম অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের ব্যাপার কি? আমি এমন কি খোস খবর এনেছি?"

আনন্দরাম হাসিয়া বলিল, "এত বড় খোস খবর আনন্দরামকে সারাজীবনে কেউ কখনও শোনায় নি। দেখিস ভাই, ইরাণী বাদশাহ শেষটা আমাকে তিন মন বাবলা কাঠ থেকে বঞ্চিত না করে।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বয়ম্বর সভা

পঞ্চনদের বসন্ত যখন হেমন্তের অন্তে পঞ্চ সায়কের সঙ্গে দেখা দিয়াছে, তখন মোগল গৌরব রবি প্রায় অস্তাচলগামী। যথাসর্ব্বস্ব পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত ধনরাশি, এমন কি, কুলকন্যা পর্য্যন্ত উপঢৌকন দিয়াও মহম্মদ শাহ নিষ্কৃতি পাইলেন না। জনার্দ্দনের চূড়ারত্ন বিশ্ববিখ্যাত কোহ্-ই-নুর মণি এবং প্রপিতামহের নয়নের মণি ময়ুর সিংহাসন ছাড়িয়া গজভুক্ত কপিত্থবৎ মহম্মদ শাহ হিন্দুস্থানের বাদশাহী ফিরিয়া পাইলেন। দিল্লী তখন শ্মশান হইয়া উঠিয়াছে। পদ নির্ব্বিশেষে প্রতিগৃহে হাহাকার, রাজধানীর চারিদিকে ঘোর দুর্ভিক্ষ। মোগল বাদশাহী এই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া নাদির শাহ দিল্লীর বাহিরে পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে সহস্র সহস্র স্ত্রী ও পুরুষ বন্দী হইয়া চলিল। রূপবতী নারী ইরাণের হাটে রূপ বেচিতে চলিল—গজদন্ত মণিমুক্তা ও রেশম দিয়া ইরাণের নগর ও রূপসী সাজাইতে। হতভাগ্যরা চলিল—পরাজিত ভারতবাসীর ধন-দৌলত-বিজেতা ইরাণীর ঘরে পৌছাইয়া দিতে। কেবল নূর বাঈ চলিল তাহার নৃত্য-চটুল নুপুর শিঞ্জনে ইরাণীর চিত্ত চঞ্চল করিতে।

বসন্তের মরুৎ যখন হেমন্তের তীব্র বায়ু কোমল করিয়া লিয়াছে, দূরদেশাগত কোকিল আবার যখন আর্য্যাবর্ত্তের কুঞ্জে গান ধরিয়াছে, অথচ বিস্তৃত ভারতের রাজধানী যখন

নিরানন্দ, তখন শাহান শাহ নাদির শাহ ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের শোণিত শোষণ শেষ করিলেন। ইরাণী ফৌজ দিল্লী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বাহ্ণে আনন্দরাম পদ্মিনী ও লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইতে চলিল। লক্ষ্মীর পিতামহী তখন তাহারই প্রতীক্ষায় বাড়ীর সদরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দিল্লীর সমস্ত সংবাদই তাঁহারা পাইয়াছিলেন, কিন্তু দিল্লীর বাহিরে হিন্দু পল্লীতে থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা ভয়ে আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাঁচকুয়া, পাহাড়ী ধিরাজ প্রভৃতি দিল্লী সহরের বাহিরের গ্রামগুলির প্রায় সকলেই পলাইয়াছিল। কেবল যাহাদের অন্য উপায় ছিল না, তাহারাই পড়িয়াছিল।

আনন্দরামকে জড়াইয়া ধরিয়া বৃদ্ধা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সে শব্দ শুনিয়া পদ্মিনী ও লক্ষ্মী ছুটিয়া আসিল। তাহাদিগের ভাব দেখিয়া আনন্দরাম হতভম্ব হইয়া গেল। সে কয় দিন আসে নাই কেন? সকলেই পলাইয়া গিয়াছে, কেবল তাহারাই পড়িয়া আছে। সে তাহাদিগকে কবে লইয়া যাইবে? কোথায় লইয়া যাইবে? নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া তিনটি রমণী আনন্দরামকে এমনভাবে ব্যস্ত করিয়া তুলিল যে, সে বিদায় লইবার কথা ভুলিয়া গেল। সে যখন প্রস্তাব করিল যে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই গুর্জ্জর গ্রামে গোলাপীর নিকট রাখিয়া আসিবে, তখন পদ্মিনী নিঃসঙ্কোচে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আর তুমি? তুমি কোথায় যাবে, আনন্দরাম?" তাহার কালো চামড়ার নীচে লাল হইয়া উঠিল। চিরসঞ্চিত অধিকারের বলে

রাণী লক্ষ্মীবাঈ যেমন বলিয়াছিলেন, "মেরী ঝাঁশী নেহি দেওয়েঙ্গে," ঠিক সেইভাবে আনন্দরামের হাত দুইখানা সবলে টানিয়া ধরিয়া অজ্ঞাত কুলশীলা বালবিধবা পদ্মিনী বলিয়া উঠিল "আমি তোমাকে আর কোথাও যেতে দেব না।" এই সময়ে জিনিষ-পত্র গুছাইবার অছিলা করিয়া লক্ষ্মীর পিতামহী সরিয়া গেলেন। আনন্দরাম পদ্মিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দুই তিনবার কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন পদ্মিনী সেই ঘরে একটা চাটাই বিছাইয়া আনন্দরামকে বসাইল। অনেকক্ষণ পরে তাহার মুখ ফুটিল, কিন্তু সে যখন বলিল যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহাকে নূর বাঈয়ের সঙ্গে বিদেশে যাইতে হইবে, তখন পদ্মিনী হাসিয়া তাহার কথা উড়াইয়া দিল। লক্ষ্মীকে পানের বাটা আনিতে বলিয়া সে চিরাভ্যস্ত গৃহিণীর মত তাহার নিকটে বসিয়া পান সাজিতে আরম্ভ করিল। আনন্দরাম অনেকবার বিদায়ের কথা তুলিল, কিন্তু পদ্মিনী তাহাকে শেষ করিতে দিল না।

আনন্দরাম যখন বলিল যে তাহাকে তখনই যাত্রা করিতে হইবে, পদ্মিনী উত্তর দিল যে, সেও সেই অবস্থায় যাত্রা করিতে প্রস্তুত। পথে বিপদের কথা জানাইলে পদ্মিনী বলিল তাহার সঙ্গে গেলে কোনই বিপদ থাকিবে না। আনন্দরাম যখন উঠিতে গেল, তখন লক্ষ্মীর সম্মুখেই পদ্মিনী তাহার পা দুইখানা জড়াইয়া ধরিল। আনন্দরাম অবশ দেহে বসিয়া পড়িল এবং লক্ষ্মী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আনন্দরাম যখন বিদায়ের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন

লক্ষ্মীর পিতামহী তাহার জন্য ষোড়শব্যঞ্জন আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বাঙ্গালী-সুলভ উচ্ছিষ্ট বিচার ভুলিয়া গিয়া সে শয্যার উপর আহার করিতে বসিয়া গেল। লক্ষ্মীও তাহার সঙ্গে বসিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া আহার করিয়া আনন্দরাম সেইখানেই তাম্বুল গ্রহণ করিল। তখন তাহার সম্মুখে বসিয়া পদ্মিনী যখন তাহার ভুক্তাবিশিষ্ট অন্ন আহার করিতে আরম্ভ করিল, তখন আনন্দরাম লজ্জায় জড়সড় হইয়া উঠিল। আহারান্তে পাত্র পরিষ্কার করিয়া পদ্মিনী আবার তাহার নিকটেই আসিয়া বসিল।

গোধূলিলগ্নে শ্যামায়মান, জনশূন্য রাজপথে সহসা সারেঙ্গী বাজিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার রবে বাঙ্গালী আনন্দরাম শিহরিল। কারণ গুর্জ্জর গ্রামপ্রান্তে সুদীর্ঘ প্রান্তরের অন্তে শ্যাম আম্রকুঞ্জে সেই সারেঙ্গী বাজিত। রব শুনিয়া আনন্দরাম পলাইতে চাহিল, দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য পদ্মিনী তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তখন আনন্দরামের বিভ্রমের মাত্রা পরিপূর্ণ করিবার জন্য দুয়ারে দাঁড়াইয়া কোকিল বিনিন্দিত কণ্ঠে একজন শ্যামসোহাগিনী চিরমধুর গান ধরিল। আনন্দরাম লজ্জায় বসিয়া পড়িল। পদ্মিনীর পদ্মরাগবর্ণ মুখখানি রক্তাভ হইয়া উঠিল, তাহার পিতামহী কিন্তু আনন্দে হাসিয়া ফেলিলেন।

গান চলিল। যে কণ্ঠের গীত দিল্লীবাসী অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ভুলিতে পারে নাই, সে কলকণ্ঠ জনশূন্যপ্রায় নগরোপকণ্ঠের গৃহদ্বারে চুম্বকের ন্যায় শত শত নরনারী

আকর্ষণ করিয়া আনিল। দেখিতে দেখিতে বনমালী ও কালে খাঁ হইতে শোভারাম পর্য্যন্ত অনেক বন্ধু বান্ধব আসিয়া পড়িল। পদ্মিনী মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া মনের আনন্দে আনন্দরামের হাত ধরিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

গান থামিল। আক্রম জমানের হাতের সারেঙ্গী নামিল। নূর বাঈ একগাছা মালা বাহির করিয়া পদ্মিনীর হাতে দিয়া সভার সকলের অনুমতি চাহিল। সকলেই সদানন্দ মনে অনুমতি দিল। তখন পদ্মিনীকে উঠাইয়া নূর বাঈ তাহাকে বলিল, "বহিন, তোমার মনের ভাব সকলের সম্মুখে ব্যক্ত কর।"

পদ্মিনী লজ্জানতনেত্রে আনন্দরামের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার গলায় মালা পরাইয়া দিল। আনন্দে বাগ্‌দীপুত্র বনমালী একটা খাস বাঙ্গলা মুল্লুকের উলু দিয়া ফেলিল।

কিন্তু নূর বাঈ যখন পদ্মিনীকে মথুরার দিকে যাইতে অনুরোধ করিল, তখন সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া লক্ষ্মী ও তাহার পিতামহী পদ্মিনীকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইলেন। প্রথম প্রহর রাত্রিতে শোভারাম দুইটা দ্রুতগ্রামী উট আনিয়া হাজির করিল। লক্ষ্মী ও তাহার পিতামহী তখনই মথুরা যাত্রা করিল।

তখন আক্রম জমান, নূর বাঈ ও আনন্দরাম পদ্মিনীকে শিক্ষা দিতে বসিল। যথা সময়ে মুসলমানী কস্‌বী সাজিয়া সানন্দে আনন্দরামের হাত ধরিয়া নূর বাঈ ও আক্রম জমানের সঙ্গে আজমীর ফটক দিয়া পদ্মিনী যমালয় সদৃশ দিল্লীনগরে

প্রবেশ করিল। ফটকের ইরাণী কর্ম্মচারী নূর বাঈকে দেখিয়া সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল; বলা বাহুল্য, আনন্দরাম ও আক্রম জমান ভেড়ুয়া সাজিয়া চলিয়াছিল। গৃহের দুয়ারে পৌঁছিয়া নূর বাঈ দেখিল যে, বাদশাহের নসকচী তাহার জন্য পরওয়ানা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে পরওয়ানা তসলিম করিয়া বলিল যে, সে হুকুম হইলেই কুচ করিতে প্রস্তুত। পদ্মিনী তখন আনন্দরামের দিকে চাহিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে।

দিল্লী নগরের প্রকাশ্য রাজপথে অবগুণ্ঠনহীনা অপরূপ-রূপ-লাবণ্যবতী নূতন নর্ত্তকীকে দেখিয়া ইরাণী, কিজিলবাস, মোগল ও তাতার মুহূর্ত্তের জন্য কুৎসিত পরিহাস করিতে ভুলিয়া গেল। এত রূপ ইরাণীর দাসত্ব করিতে যাইবে ভাবিয়া সহৃদয় দিল্লীবাসী গোপনে অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিল। কিন্তু সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে রমণী সহাস্য বদনে চলিয়াছে। পদ্মিনীর অধরের কোণে একটা অব্যক্ত মধুর হাসির ঈষৎ রেখা ফুটিয়াছিল, কারণ সে নির্নিমেষ নয়নে আনন্দরামের মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

নূর বাঈ দিল্লীর পথে হাঁটিয়া চলিয়াছে শুনিয়া দুই দশজন মাসুক তাহার সঙ্গ লইল। কেহ কেহ নূতন নর্ত্তকীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। নূর বাঈ উত্তর দিল যে, সে তাহার বহিন্। অনেক গত-যৌবন মাসুক প্রকাশ্যে আফশোষ করিয়া বলিল যে, এমন রত্ন লইয়া নূর বাঈ শেষটা ইরাণের মরুভূমিতে ডালি দিতে চলিয়াছে। মহাসমারোহে হাজার হাজার লোকের

সঙ্গে নূর বাঈ ও তাহার দল চাঁদনী চৌকের মধ্যে তাহার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। খবরটা দিল্লী সহরময় জাহির হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং ইতরভদ্র বহু নরনারী চাঁদনী চৌকের চারিধারে জমায়েত হইয়াছিল। দুইধারে দুই হাতে সেলাম করিতে করিতে নূর বাঈ নিজের কাটরায় প্রবেশ করিল। লোকের ভিড় কমিতে লাগিল। ক্রমে সুবিধা বুঝিয়া আনন্দরাম ও আক্রম জমান কাটরার বাহিরে ভিড়ে মিশিয়ে গেল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইরাণ যাত্রা

শাহান শাহ নাদির শাহ চলিলেন। ইরাণী সিপাহী চলিল। ভারতীয় বন্দী চলিল। হাতী, উট ও ঘোড়া বোঝাই হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের শত শত বৎসরের সঞ্চিত ধনরত্ন চলিল। তাহাদের মধ্যে মাননীয়া মহারাণীর মত চলিল নূর বাঈ, আর তাহার নূতন বহিন্ ভাগ বাঈ ওরফে পদ্মিনী। যেথানেই সন্ধ্যা হয়, সেইখানেই বৃক্ষতলে অথবা মুক্ত আকাশের তলে নূর বাঈ গানের মজলিস আরম্ভ করিয়া দেয়। আহার নিদ্রা ভুলিয়া চারিদিক হইতে ইরাণী সেনা ছুটিয়া আসে। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত পুরাদমে মজলীস চলে এবং সেই অবসরে বন্দী পলায়। কোন দিন দুই দশ জন, কোন দিন বা দুই চারিশত। বন্দী ও বন্দিনী মুক্তি লাভ করিয়া কোথায় যে যায়, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। ভুতে যেন তাহাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়। দূরে অশ্বপদ শব্দ শুনা যায়; কিন্তু ইরাণী ফৌজ ছুটিয়া গিয়া তাহাদের ধূলা পর্য্যন্ত দেখিতে পায় না। অনেক দূর গেলে কৃতান্ত সদৃশ গুর্জ্জর ও মেওয়াড়ী কাহাকেও জীবন্ত ফিরিতে দেয় না।

দুই তিন দিন পরে ইরাণী ফৌজের সকলেই চটিল; কারণ হিন্দুস্থানের সেরা সহর দিল্লী হইতে তাহারা পছন্দমত ও বিনা অনুমতিতে যে রমণী-রত্ন আহরণ করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদের অনেকগুলিই উধাও হইল। সিপাহী চটিল। কারপরদাজ

রাগিল। কড়া পাহারা বসিল। তথাপি বন্দী পলাইল। একদিন তাঁবুতে আগুন লাগিল। তাহার পরদিন ঘোড়া ও উটের মধ্যে আট দশটা নেকড়ে দেখা দিল। তৃতীয় দিনে অতিরিক্ত ভাঙ খাইয়া দশ বারটা হাতী শিকল ছিড়িয়া অনেক লোক মারিয়া ফেলিল। কিন্তু একটাও হিন্দুস্থানী মরিল না। ক্রমে তহমাপ্প খাঁর সন্দেহ বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে নূর বাঈয়ের দলের উপরে তাহার নজর পড়িল। তাহাদের তাঁবুর চারিদিকে একটার পরিবর্ত্তে চারিটা চৌকি বসিল, কিন্তু সেই রাত্রিতে সকলের অধিক বন্দিনী পালাইল।

বন্দিনীর সংখ্যা অর্দ্ধেকের কম হইয়া দাঁড়াইলে, সংবাদ শাহান শাহের কর্ণে পৌঁছিল। লোকে বলে যে, হিন্দুস্থানী রমণী ইরাণে লইয়া যাওয়া নাদির শাহের মত ছিল না। কিন্তু বন্দিনী মুক্তি পাওয়াতে তিনি চটিলেন। মুখে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু প্রতি রাত্রিতে বন্দিনীদের গড়বন্দী করিয়া রাখিবার হুকুম হইল।

সেই রাত্রিতে নূর বাঈ নাদির শাহের মৃত্যুবাণ ছাড়িল। তাহার নূতন বহিন্ ভাগ বাঈ সেই রাত্রিতে প্রথম শাহান শাহের মজলীসে পেশোয়াজ পরিয়া নামিল। ভাগ বাঈয়ের মূর্ত্তি দেখিয়া কেবল শাহান শাহ মজিলেন না, ইরাণী চাবদার ও নসকচী পর্য্যন্ত মোহিত হইল। নূতন নর্ত্তকী হতভাগ্য মোগল বাদশাহের প্রাসাদ হইতে লুণ্ঠিত মুক্তামালা শিরে পরিয়া তাম্বুতে ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে রব উঠিল, গুর্জরের গড়বন্দী ভাঙ্গিয়া শতেক বন্দিনী কাহারা উদ্ধার করিয়া লইয়া

গিয়াছে। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া শাহান শাহ নাদির শাহ চারিদিকে হাজার হাজার সওয়ার ছুটাইলেন। তাহারা বহুদূরে গিয়াও দূর হইতে ধূলা দেখিয়া ফিরিয়া আসিল।

পরদিন প্রভাতে শাহান শাহের আদেশে যাত্রা বন্ধ রহিল। সংবাদ শুনিয়া আনন্দরাম পদ্মিনীর মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিপাতে নবরবিকরোদ্ভাসিত কমলিনীর মত বিকশিত জ্যোতি। পদ্মিনী আনন্দে আত্মহারা হইয়া দয়িতের প্রেমদৃষ্টি প্রত্যর্পণ করিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দীদের মুক্তি

যাত্রাবন্ধের আদেশ কেন প্রচারিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। নূর বাঈ, আক্রম জমান, গোলাপী, আনন্দরাম ও পদ্মিনী প্রস্তুত হইয়া রহিল। কিন্তু তাহাদের কোতলের হুকুম আসিল না।

যাত্রা আরম্ভ হইল। সারিদিয়া হাজার হাজার সওয়ার উত্তর দিকে চলিল। তাহাদের পরে দিল্লীর লুঠের মালবোঝাই হাতী ও উট; তাহার পর বন্দী ও বন্দিনীগণ। তাহার পর কামান। সকলের শেষে পদাতিক।

এত সাবধান হইয়াও শাহান শাহ নাদির শাহ বন্দীর পলায়ন রোধ করিতে পারিলেন না। প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত ঝড়ের মত গুর্জ্জর ও জাঠ এই বিশাল বাহিনীর কোন না কোন স্থানে পড়িত। তাহারা যাহা পাইত তাহাই লুঠিয়া পলাইত। কোন কোন দিন একসঙ্গে মাল ও বন্দিনী-দিগের উপরে আক্রমন হইত। হয়ত দশ জন যুদ্ধ করিত; বাকী এক শত জন মাল অথবা বন্দিনী লইয়া পলাইত। বহু চেষ্টা করিয়াও নাদির শাহ লুঠ বন্ধ করিতে পারিলেন না। যাহারা লুঠ করিতে আসিত, তাহারা মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিত। ধরা পড়িলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিত। চেহারা দেখিয়া বোধ হইত, তাহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান। তাহাদের বীরত্ব দেখিয়া ইরাণীরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সকলেই

বলিতে আরম্ভ করিল যে হিন্দুস্থানের বাদশাহের ফৌজে যদি এমন লোক থাকিত, তাহা হইলে কর্নাল হইতে ইরাণীদের ইরাণে ফিরিয়া যাইতে হইত।

যাত্রার তৃতীয় দিনে সন্ধ্যাবেলায় নূর ও ভাগ বাঈয়ের তলব পড়িল। যন্ত্রী ও বাদক লইয়া তাহারা যখন মজলীসের তাঁবুর সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন চৌকীর সিপাহীরা তাহাদের জানাইল যে, মজুরা হইবে না। কেবল দুইজন তওয়াইফের তলব হইয়াছে। যন্ত্রী ও বাদকরা নজরবন্দী থাকিবে।

নূর বাঈয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু ভাগ বাঈ হাসিতে হাসিতে তাহার হাত ধরিয়া তাঁবুর ভিতরে চলিল। আনন্দরাম ও আক্রম জমান যন্ত্রীদের ভিতরে ছিলেন। তাঁহাদের মুখ শুকাইল। আক্রম জমান বুকের ভিতর হইতে একখানা বড় ছোরা বাহির করিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু আনন্দরাম তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে অস্ত্র আছে।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দীদের তাঁবু জ্বলিল

গ্রামপ্রান্তে যে দিন সন্ধ্যায় শাহান শাহের মজলীসের তাঁবুতে নূর বাঈ ও ভাগ বাঈএর তলব হইয়াছিল, সেই দিন শাহান শাহের তাঁবুর নিকটে একটি জনশূন্য গণ্ডগ্রামে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে দশ জন অশ্বারোহী উপস্থিত হইল। সকলেরই ঘোড়া ছোট কিন্তু বলবান। সকল অশ্বারোহীই হৃষ্টপুষ্ট। কিন্তু তাহাদের সূক্ষ্ম শুভ্র বসনের অন্তরাল হইতে ধাতুর শব্দ হইতেছিল। প্রত্যেকের হাতে বল্লম ও ঢাল। পৃষ্ঠে বন্দুক ও কটিবন্ধে তরবারি। তাহারা সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃক্ষের ছায়ার মত লুকাইয়া একে একে গ্রামটিতে প্রবেশ করিয়াছিল।

গ্রাম জনশূন্য কিন্তু নীরব নহে। সমস্ত দিন হতভাগ্য গ্রামবাসীদের শব লইয়া টানাটানি করিয়াও শৃগাল ও শকুনির ক্ষুধা তৃপ্ত হয় নাই। অনেকক্ষণ পরে জীবন্ত মনুষ্য দেখিয়াও তাহারা সরিল না। আগন্তুকরা শুষ্কমুখে দেখিল যে, ঘরের দুয়ারে ছিন্নশীর্ষ শিশুর শব আলিঙ্গন করিয়া ভল্লবিদ্ধা মাতা লুটাইয়া আছে। বেনিয়ার দোকানে আটা, ডাল ও চাউল পথে নররক্তের সহিত মিশ্রিত হইতেছে। মসজেদের সম্মুখে ছিন্ন কোর-আন্ বুকে লইয়া ছিন্ন-শির পেশ-ইমাম্ লুটাইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মস্তক কোর্-আনের পরিবর্ত্তে বেদীর উপর রক্ষিত।

আগন্তুকের মুখের পেশী দৃঢ় হইয়া উঠিল। কেহ বলিল, “ইনশা আল্লাহ!” কেহ বা বলিল, “হে ভগবান!”

তখন ইরাণের শাহান শাহের মজলীসে তাঁবুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া দুইটি রূপসী ভারতীয় মহিলা ভারত-বিজেতা নাদির শাহকে কুনিশ করিতেছিল। আজ আর কেহ নূর বাঈকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল না। গুলাবের পিচকারী ছুটিল না। রাশি রাশি ফুল আসিল না। শাহান শাহও হাসিলেন না।

কর্কশ কণ্ঠে নাদির শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “রোজ আমার লস্কর লুঠতে আসে কে?”

আবার তসলিম করিয়া নূর বাঈ বলিল, “হিন্দুস্থানের মরদ।”

নাদির শাহের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কোষ হইতে অসি বাহির করিয়া বলিলেন, “বাঁদী, বড় সাফ সাফ জবাব দিচ্ছিস্।”

“বাঁদী, শাহান শাহের বাঁদী। বরাবর সত্য কথাই বলে আসছে।”

“যারা লুঠ করতে আসে, তারা কি কেবল হিন্দু?”

“না, জাঁহাপনাহ্, হিন্দু ও মুসলমান সব জাতেই এক হয়ে গিয়েছে।”

“জানিস্, আমি কে?”

“জাঁহাপনাহ্, ইরাণ, তুরাণ, শান ও রূমের শাহান শাহ। আর আমি দিল্লীর একজন সামান্য কস্‌বী।”

“তুই সমস্ত জানিস?”

“জানি।”

"সকল কথা খুলে বল্। তা হলে মাফ্ হবে।"

"জাঁহাপনাহ্, আমি জানি, কিন্তু বল্‌ব না। আমার গর্দান শাহান শাহের। কিন্তু মন শাহান শাহের উপর যে সকলের বড় একজন শাহান শাহ আছে—তাঁর।"

নূর বাঈ মস্‌নদের কাছে আসিয়া মাথা পাতিয়া দিল।

নাদির শাহ হাসিয়া বলিলেন, "এত সহজে নয়। বিলম্ব আছে। ওঠ্।"

নূর বাঈ উঠিল।

নাদির শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি জানিস্, তবে কেন বল্‌বি না?"

নূর বাঈ নাদির শাহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "শাহান শাহ, বাদশাহ হয়ে কেউ দুনিয়ায় আসে না। তোমার কি কোন দিন মা, বহিন বা মেয়ে ছিল না? আমি কসবী বটে, কিন্তু আমারও একদিন মা বোন ছিল। সে জন্য বলব না।"

"জবাব বুঝতে পারলাম না।"

নূর বাঈ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে শব্দ শুনিয়া জগ বাঈ শিহরিয়া উঠিল।

নূর বাঈ বলিল, "শাহান শাহ, মোগল বাদশাহ ক্লীব বলে হিন্দুস্থানের হিন্দু মুসলমান কি স্নেহ মমতা ভুলে গিয়েছে? যাদের মা বহিন্ ধরে এনে ইরাণে নিয়ে যাচ্ছ, তারাই তোমার লস্কর লুঠ করছে।"

"তুই তাদের জানিস্?"

"সকলকে না জানি, অনেককেই জানি।"

"নাম বল্।"

"বিশ্বাসঘাতক হব না, শাহান শাহ।"

"এখনই তোর জিভ্‌টা উপড়ে ফেলে দেবো।"

নূর বাঈ বাদশাহের তক্তের সম্মুখে আবার মাথা পাতিয়া বলিল, "হুকুম, শাহান শাহ।"

তখন তহমাস্প খাজল উঠিয়া নাদির শাহকে শান্ত করিলেন। নসকচীরা রমণীদ্বয়কে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল।

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে দূরে ইরাণী সেনানিবাসের একপ্রান্তে কোলাহল উঠিল। চারিদিক হইতে বন্দিনাগণের শিবির আক্রান্ত হইল। ইরাণীরা সেদিন প্রস্তুত হইয়া ছিল। সুতরাং ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। লস্করেরা চারিদিক হইতে ইরাণী সৈন্য বন্দী রক্ষা করিতে ছুটিল; সে দিন যাহারা ইরাণী শিবির আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা লুঠ করিতে আসে নাই। তাহারা হতভাগ্য ভারতবাসী নর-নারীকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল। তখনকার ইতিহাস আছে। হিন্দুরও আছে, মুসলমানেরও আছে। কিন্তু যে মুষ্টিমেয় হিন্দু ও মুসলমান বীর ভারতীয় মহিলার সম্মান রক্ষা করিতে আসিয়া রক্তের অক্ষরে তাহাদের ভগবান বা খোদার ইতিহাসের প্রতি পত্রে নিজের নাম উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছে, আজ আসমুদ্র হিমানীমেখলামণ্ডিত ভারতে তাহাদের নাম খুঁজিয়া পাইবে না।

ক্রমে হাজার হাজার মশাল জ্বলিয়া উঠিল। দূরে দু'একটা ছোটখাট কামানের শব্দ হইল। আক্রম জমান ছটফট করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া আনন্দরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল সাহেবজাদা?"

আক্রম জমান বলিয়া উঠিলেন, "এই সময়ে আমরা এখানে পড়ে রইলাম আনন্দরাম ?"

আনন্দরাম হাসিয়া বলিল, "তোমার খোদা এবং আমার ভগবান যার বরাতে যা মাপিয়েছেন।"

ক্রমে মশাল নিভিয়া আসিল। গোলমাল দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু দেখা গেল সেইদিকে আরও লোক ছুটিতেছে। হঠাৎ দুইখানা বারুদের গাড়ী ফাটিয়া গেল। দিগন্তপ্রসারী লেলিহান অনলের লোহিত শিখায় চারিদিক উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। আনন্দরাম সানন্দে বলিয়া উঠিল, "সাবাস, খতম, সাহেবজাদা, সব শেষ। ঐ দেখ বন্দাদের তাঁবু জ্বলছে।"

রাত্রি কাটিয়া গেল। সে দিনও যাত্রা স্থগিত রহিল। প্রভাতে আনন্দরাম সংবাদ পাইল যে সমস্ত বন্দী ও বন্দিনী মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের জন্য প্রায় দুই হাজার হিন্দু ও মুসলমান সেই উত্তর-মালবের জলহীন মরুবৎ প্রান্তরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ আক্রম জমান পাগল হইয়া উঠিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দুইটি উপরে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বাঙ্গলার হতভাগ্য নবাবপুত্র বলিয়া উঠিল, "অয় খোদা, তোমারই মেহেরবাণী। এই দুই হাজার ভদ্রসন্তান তোমার কোরবাণি হয়ে হিন্দুস্থানী মুসলমানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। অয় খোদা, তুমি করিম, তুমি রহিম! এখন কেবল আমাদের ডেকে নাও।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মুক্তি

শাহান শাহ নাদির শাহ যখন শুনিলেন যে, রাত্রিতে যাহারা আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা বন্দী ও বন্দিনীদের সকলকেই লইয়া গিয়াছে, তখন তিনি নূর বাঈকে আনিতে আদেশ করিলেন। নূর বাঈ তখনও মজলীসের পোষাক পরিয়াছিল। সেই অবস্থাতেই লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া তাহাকে আনা হইয়াছিল।

নূর বাঈ হাসিতে হাসিতে মাথা নোয়াইয়া শাহান শাহকে অভিবাদন করিল। ভ্রুভঙ্গী করিয়া নাদির শাহ বলিয়া উঠিলেন, "এখনও যদি না বলিস, তা'হলে তোকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।"

নূর বাঈ আবার হাসিয়া শির নোয়াইয়া উত্তর দিল, "জান ও গর্দ্দান শাহান শাহের।"

তখন নাদির শাহ ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার দলের সমস্ত লোককে বাঁধিয়া আনিতে হুকুম করিলেন। সকলে আসিলে নাদির শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে সব শয়তান আমার গোলাম আর বাঁদী নিয়ে পালাচ্ছে, তাদের নাম কেউ জানিস্?"

প্রথমে কেহ উত্তর দিল না।

তখন হুকুম হইল, "সকলের আগে এই তওয়াইফ্‌কে কুত্তা দিয়ে খিলাও।"

হুকুম শুনিয়া আক্রম জমান্ ও আনন্দরাম আগে দাঁড়াইয়া কহিল, "শাহান শাহ দীন ও তুনিয়ার মালিক। নূর বাঈ নিরপরাধা। প্রকৃত অপরাধী আমরা তুজনে।"

নাদির শাহ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?"

আক্রম জমান কহিলেন, "আমি সুবা বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব নাজিম সুজাউদ্দীন খাঁর পুত্র।"

আনন্দরাম কহিল, "জাঁহাপনাহ, আমি সেই বাঙ্গালী বহুরূপী।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া নাদির শাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সেই বহুরূপী? প্রমাণ করতে পার?"

"হুকুম করুন, হাত খুলে দিন।"

শাহান শাহের হুকুমে আনন্দরাম মুক্তি পাইয়া পাগড়ী, পরচুলা ও দাড়ী খুলিয়া ফেলিল। অনেকেই তাহাকে চিনিত। তাহারা বলিয়া উঠিল, "সত্যইত, এই সেই বহুরূপী।"

নাদির শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন হাওয়া হয়ে উড়ে যেতে পার?"

আনন্দরাম উত্তর দিল, "পারি, কিন্তু আর প্রয়োজন নেই, শাহান শাহ।"

"আগে কি প্রয়োজন ছিল?"

"হিন্দুস্থানের কুল-মহিলাদের বন্ধন-মুক্তি।"

"সমস্ত ষড়্‌যন্ত্রের মূল তুমি?"

"শাহান শাহ ঠিক বলেছেন।"

"যদি উড়ে যাবার ক্ষমতা তোমার আছে, তা'হলে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাচ্ছ না কেন?"

"প্রাণে আর বিশেষ প্রয়োজন নেই। শাহান শাহ, এই দলের সব লোক নিরাপরাধ, প্রধান দোষী আমি। দিল্লীর প্রধান বাঈ নূর বাঈ হিন্দুস্থানের কুল-মহিলাদের সম্মান বাঁচাবার জন্য আমার অনুরোধে সর্ব্বস্ব ব্যয় করে শেষে নিজের ইচ্ছায় আপনার সঙ্গে ইরাণে চলেছিলেন। সাহেবজাদা আক্রম জমান খাঁ আমারই প্ররোচনায় এ দলে মিশেছেন। এ দলে কেউ দোষী নয়, কেবল দোষী আমি। যে শাস্তি দেবেন, সমস্তই আমাকে দিন। শাহান শাহ দুনিয়ার বিচারক। ন্যায্য বিচার করুন।"

তখন জগ বাঈরূপী পদ্মিনী ছুটিয়া গিয়া নাদির শাহের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

সে বলিয়া উঠিল, "বাদশাহ, সকল দোষের মূল আমি। আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার স্বামী আপনার চরণে অপরাধী হয়েছেন।"

আক্রম জমান বলিয়া উঠিলেন, "শাহান শাহ, আপনি মুসলমান—আমিও মুসলমান। খোদার পবিত্র নামে কশম্ করে বলছি, প্রকৃত দোষী আমি। যে শাস্তি দিতে হয়, আমাকে দিন। নির্দ্দোষের প্রতি অবিচার করবেন না।"

গোলাপী কথা খুঁজিয়া না পাইয়া আক্রম জমানের কণ্ঠলগ্না হইল।

নূর বাঈ পাগলের মতো হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, "খোদার মহিমা কি সুন্দর! আল্লার কৃপা অপার! চল সব এক সঙ্গে যাই, এক সঙ্গে যাই!"

তহমাপ্প খাজল, নাদির শাহের কানে কানে কি বলিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া নাদির শাহ হাসিলেন। তিনি নূর বাঈকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলে এক সঙ্গে যেতে চাও, তওয়াইফ?"

নূর বাঈ শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তে তস্‌লীম করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "শাহান শাহের কেরামেৎ।"

নাদির শাহের হুকুমে পনের জন জহ্লাদ আসিল।

সমস্ত বন্দী শাহান শাহের সম্মুখে মাথা পাতিয়া দিল।

সকলের আগে নূর বাঈ। তাহার পশ্চাতে এক শ্রেণীতে আনন্দরাম ও পদ্মিনী এবং আক্রেম জমান ও গোলাপী। আর সকলে তৃতীয় শ্রেণীতে বসিল।

পনের খানা তরবারি আকাশে ঝলকিয়া উঠিল। কেহ কেহ চক্ষু মুদ্রিত করিল।

নূর বাঈয়ের মস্তকে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড গোলাপের মালা আসিয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে পনের জন নসকচী পনের খানা তরবারি ধরিয়া ফেলিল।

নাদির শাহ হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু বন্দীদের কেহই মাথা তুলিল না। সকলেই নীরবে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।